لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ —বাক্যে الى শব্দটি فى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্র করা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্র করতে থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন।--(কুরতুবী)

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ —সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে ঃ ان رحمتى سبقت على غضبى অর্থাৎ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। (কুরতুবী)

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ —এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফির ও মুশরিকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ, তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন করে নি।---(কুরতুবী)

لَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এখানে سكون অর্থ استقرار (অবস্থান করা), অর্থাৎ পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত, তা সবই আল্লাহ্র। অথবা এর অর্থ سكون و حركت- এর সমষ্টি। অর্থাৎ ما سكن وما تحرك (স্থাবর ও অস্থাবর)। আয়াতে শুধু سكون উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত حركت আপনা-আপনিই বোঝা যায়।

قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑮ مَنْ يُّصْرَفْ
عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۭ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ⑯ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ
اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۭ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرٌ ⑰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ⑱
قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۭ قُلِ اللّٰهُ ۣ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۣ

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ
اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ⑲ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ
كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑳
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا
يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ㉑

(১৫) আপনি বলুন ঃ আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি। (১৬) যার কাছ থেকে ঐ দিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্র অনুকম্পা হবে। এটাই বিরাট সাফল্য। (১৭) আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১৮) তিনি পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (১৯) আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে ? বলে দিন ঃ আল্লাহ্ ; আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে—যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছে—সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে ? আপনি বলে দিন ঃ আমি এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলে দিন ঃ তিনিই একমাত্র উপাস্য ; আমি অবশ্যই তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। (২০) যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২১) আর যে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালিম কে ? নিশ্চয় জালিমরা সফলকাম হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয় আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হওয়াকে (অর্থাৎ ইসলাম ও ঈমানের আদেশ পালন না করাকে কিংবা শিরকে লিপ্ত হওয়াকে এজন্য) ভয় করি কেননা, আমি একটি মহাদিবসের (কিয়ামতের) শাস্তির ভয় করি। [এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষ্পাপ। ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে শিরক ও গোনাহ্ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এখানে উম্মতকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, নিষ্পাপ পয়গম্বর

আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করেন। অতঃপর বলেন, এ শাস্তি এমন যে,] যার উপর থেকে এ শাস্তি সরিয়ে দেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা বড় করুণা করবেন ; আর এটিই (অর্থাৎ শাস্তি সরে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র করুণা লাভ করতে পারাই হল) প্রকাশ্য সফলতা। (এতে অনুগ্রহ বর্ণিত হয়ে গেল, যা ইতিপূর্বে كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ---বাক্যে উল্লেখিত হয়েছিল) এবং (আপনি তাদেরকে একথাও বলে দিন যে, হে মানব) যদি আল্লাহ্ তা'আলা (ইহকালে কিংবা পরকালে) তোমাকে কোন কষ্টের সম্মুখীন করেন তবে তা তিনিই দূর করবেন (কিংবা করবেন না, শীঘ্র করবেন কিংবা দেরীতে করবেন।) আর যদি তোমাকে (এমনিভাবে) কোন উপকার পৌঁছান (তবে তাতেও বাধাদানকারী কেউ নেই। যেমন, অন্য আয়াতে لَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ বলা হয়েছে। কেননা,) তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (এবং উল্লেখিত বিষয়টির প্রতি আরো জোর দেওয়ার জন্য আরও বলে দিন যে,) তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে) স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রান্ত ও উচ্চতর এবং (জ্ঞানের দিক দিয়ে) তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সুতরাং জ্ঞান দ্বারা তিনি সবার অবস্থা জানেন, শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা সবাইকে একত্র করবেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপযুক্ত প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন।) আপনি (তওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসীদেরকে) বলুন ঃ (আচ্ছা বল তো দেখি,) প্রবলতর সাক্ষ্যদাতা কে ? (যার সাক্ষ্যে সবার মতভেদ দূর হয়ে যায় ? এর স্বতঃসিদ্ধ উত্তর এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই প্রবলতর।) আপনি বলুন ঃ আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, তাতে) আল্লাহ্ তা'আলাই সাক্ষী (যাঁর সাক্ষ্য প্রবলতর)। বস্তুত (তাঁর সাক্ষ্য এই যে,) আমার প্রতি এ কোরআন (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) ওহীযোগে এসেছে---যাতে আমি এ কোরআন দ্বারা তোমাদের এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছবে, সবাইকে (ঐসব শাস্তি সম্পর্কে) ভয় প্রদর্শন করি (যা একত্ববাদ ও রিসালতে অবিশ্বাসীদের জন্য এতে উল্লেখিত রয়েছে। কেননা, কোরআন মজীদের অলৌকিকত্ব এবং এর সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে বিশ্বাসীদের অক্ষমতা ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগত সাক্ষ্য, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্ [সা]-র সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া কোরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার আইনগত সাক্ষ্য হয়ে গেছে।) তোমরা কি (এ প্রবলতর সাক্ষ্যের পরও, যাতে একত্ববাদও অন্তর্ভুক্ত) একত্ববাদ সম্পর্কে সত্যি সত্যি এ সাক্ষ্যই দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে (ইবাদতের হকদার হওয়ার ব্যাপারে) আরও উপাস্য (শরীক) রয়েছে ? (এবং এতেও যদি তারা হঠকারিতা করে বলে যে, হ্যাঁ আমরা তো এ সাক্ষ্যই দেব, তবে তাদের সাথে বিতর্ক অর্থহীন। বরং শুধু) আপনি (স্বীয় বিশ্বাস প্রকাশার্থে) বলে দিন ঃ আমি তো এ সাক্ষ্য প্রদান করি না। আপনি আরও বলে দিন ঃ তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং অবশ্যই আমি তোমাদের শেরেকী থেকে মুক্ত। (আর আপনার রিসালত সম্পর্কে তারা যে বলে, আমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি, এ ব্যাপারে সত্য ঘটনা এই যে,) যাদেরকে আমি (তওরাত ও ইঞ্জীল) কিতাব দান করেছি, তারা সবাই রসূল (সা)-কে (এমনভাবে) চেনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। (কিন্তু প্রবলতর সাক্ষ্যের উপস্থিতিতে যখন আহ্‌লে-কিতাবদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়, তখন তাদের সাক্ষ্য না থাকলেও

কোন ক্ষতি নেই এবং এ প্রবলতর সাক্ষ্যের উপস্থিতিতেও) যারা নিজেদের বিবেককে নষ্ট করেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (বিবেককে নষ্ট করার অর্থ তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া---কাজে না লাগানো) যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা আল্লাহ্ তা‘আলার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ করে, তার চাইতে অধিকতর অত্যাচারী আর কে আছে ? এমন অত্যাচারীরা (কিয়ামতের দিন) নিষ্কৃতি পাবে না (বরং চিরস্থায়ী আযাবে পতিত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা‘আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, মনে কর, যদি আমিও স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষ্পাপ। তাঁর দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীদের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যরা কোন্ ছার !

এর পর বলা হয়েছে : مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ --অর্থাৎ হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র অশেষ করুণা হয়েছে। وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ---অর্থাৎ এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ। এতে বোঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ করা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা‘আলা। সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যত একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশী এর কোন গুরুত্ব নেই।

کار زلفِ تست مشک افشانی اما عاشقاں
مصلحت را تہمتے بر آہوئے چیں بستہ اند

এ বিশ্বাসটিও ইসলামের অন্যতম বৈপ্লবিক বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মুসলমানদের সমগ্র সৃষ্টি জগৎ থেকে বিমুখ করে একমাত্র স্রষ্টার মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। ফলে মুসলমানরা এমন একটি নজীরবিহীন সদাপ্রফুল্ল সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে গেছে, যারা দারিদ্র্যে এবং উপবাসেও সারা বিশ্বের উপর ভারী---কারও সামনে মস্তক অবনত করতে জানে না।

فقر میں بھی میں سر بسر فخر و غرور و ناز ہوں
کس کا نیاز مند ہوں سب سے جو بے نیاز ہوں

কোরআন-মজীদে এ বিষয়বস্তুটি বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে রহমত মানুষের জন্য খুলে দিয়েছেন তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই এবং যাকে তিনি আটকে দেন, তাকে খুলে দেওয়ারও কেউ নেই। সহীহ্ হাদীস-সমূহে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই দোয়ায় একথা বলতেন ঃ

اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আপনি যা দান করেন, তাকে বাধাদানকারী কেউ নেই, আপনি যা আটকে দেন, তার কোন দাতা নেই এবং আপনার বিপক্ষে কোন চেষ্টাকারীর চেষ্টা উপকার সাধন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পেছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ হে বৎস ! আমি আরয করলাম ঃ আদেশ করুন, আমি হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্কে স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তোমাকে স্মরণ রাখবেন। তুমি আল্লাহ্কে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় তাঁকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ্কে স্মরণ রাখলে বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোন কিছু যাচ্না করতে হলে তুমি আল্লাহ্র কাছেই যাচ্না কর এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই---তোমার এমন কোন উপকার করতে সমগ্র সৃষ্ট জীব সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তারা কখনও তা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্য ধারণ করতে পার তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা, স্বভাববিরুদ্ধ কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহ্র সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত---কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত। ---(তিরমিযী, মসনদে-আহমদ)

পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথভ্রান্ত। তারা আল্লাহ্ তা'আলার সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে না। বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ্-তা'আলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গম্বর ও ওলীদের ওছিলায় দোয়া করা ভিন্ন কথা, এটা জায়েয। স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর শিক্ষায় এর প্রমাণ রয়েছে। সরাসরি কোন সৃষ্ট জীবকে অভাব পূরণের জন্য ডাকা এ কোরআনী নির্দেশের পরিপন্থী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সরল পথে কায়েম রাখুন।

আয়াতের শেষে বলেছেন ঃ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মহত্তম ব্যক্তিরাও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার মনোবান্ছা পূর্ণ হয় না, তিনি নৈকট্যশীল রসূলই হোন কিংবা রাজাধিরাজ।

তিনি প্রজ্ঞাময়ও বটে, তাঁর সব কাজেই প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বিদ্যমান। তিনি সর্বজ্ঞ। আয়াতে قَاهِر শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য এবং حَكِيْم শব্দ দ্বারা সবকিছু বেষ্টনকারী জ্ঞান বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, পরাকাষ্ঠামূলক যাবতীয় গুণ-প্রজ্ঞা ও শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা একক।

অধিকাংশ তফসীরবিদ পঞ্চম আয়াতের একটি বিশেষ শানে-নযুল উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, মক্কাবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-র দরবারে এসে বলল ঃ আপনি রসূল হওয়ার দাবী করেন। এ দাবীর পক্ষে আপনার সাক্ষী কে? কেননা, আপনার সত্যায়ন করার মত কোন লোক আমরা পাইনি। আমরা খৃস্টান ও ইহুদীদের কাছে এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের পুরোপুরি চেষ্টা করেছি।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ ---অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্র চাইতে অধিক প্রবল কোন্ সাক্ষ্য হবে? সারা জাহান এবং সবার লাভ-লোকসান তাঁরই আয়ত্তাধীন। অতঃপর আপনি বলে দিন ঃ আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ সাক্ষী। আল্লাহ্র সাক্ষ্যের অর্থ ঐসব মো'জেযা ও নিদর্শন, যা আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-র সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন। তাই পরের আয়াতে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এ সাক্ষ্যের পরও কি তোমরা এর বিপক্ষে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যও শরীক আছে। এরূপ করলে স্বীয় পরিণাম ভেবে নাও, আমি এরূপ সাক্ষ্য দিতে পারি না।

قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ---অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা একক উপাস্য ; তাঁর কোন অংশীদার নেই।

আরও বলা হয়েছে ঃ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ অর্থাৎ আমার প্রতি ওহীযোগে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে যেন এর মাধ্যমে আমি তোমাদের আল্লাহ্র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করি এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি, যাদের কাছে কিয়ামত পর্যন্ত এ কোরআন পৌঁছবে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) সর্বশেষ নবী এবং কোরআন আল্লাহ্র সর্বশেষ কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত এর শিক্ষা ও তিলাওয়াত বাকী থাকবে এবং এর অনুসরণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য হবে।

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা) বলেন ঃ যার কাছে কোরআন পৌঁছে গেল, সে যেন মুহাম্মদ (সা)-এর সাক্ষ্য লাভ করল। অন্য এক হাদীসে আছে, যার কাছে কোরআন পৌঁছে আমি তার ভীতি-প্রদর্শক।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরামকে জোর দিয়ে বলেন ঃ بلغوا عنى ولو اية অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলী ও শিক্ষাকে মানুষের কাছে পৌঁছাও---যদি তা একটি আয়াতও হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সতেজ ও সুস্থ রাখুন, যে আমার কোন উক্তি শুনে তা স্মরণ রাখে ; অতঃপর তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক সময় প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে পরোক্ষ শ্রোতা কালামের মর্ম অধিক অনুধাবন করে।

সর্বশেষ আয়াতে কাফিরদের এ উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে যে, আমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের কাছ থেকে তথ্যানুসন্ধান করে জেনে নিয়েছি, তাদের কেউই আপনার সত্যতা ও নবুয়তের সাক্ষ্য দেয় না। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ---অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এমনভাবে চিনে, যেমন করে চিনে নিজের সন্তানদেরকে।

কারণ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৈহিক আকৃতি, জন্মভূমি, হিজরত-ভূমি, অভ্যাস, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। এ বর্ণনার পর কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শুধু মহানবী (সা)-র আলোচনাই নয়---তাঁর সাহাবায়ে-কিরামের বিস্তারিত অবস্থাও তওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি তওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে এবং তা পাঠ করে, সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনবে না এরূপ সম্ভাবনা নেই।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তুলনামূলকভাবে বলেছেন ঃ 'যেমন, মানুষ নিজ সন্তানদের চেনে।' একথা বলেন নি যে, 'যেমন সন্তানরা পিতা-মাতাকে চেনে।' এর কারণ এই যে, পিতামাতার পরিচয় সন্তানের জন্য অত্যধিক সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। সন্তানের দেহের প্রত্যেকটি অংশ পিতামাতার দৃষ্টিতে থাকে। তারা শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাদের হাতে ও ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়। তাই পিতামাতা সন্তানকে যতটুকু চিনতে পারে ততটুকু সন্তান পিতামাতাকে চিনতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) পূর্বে ইহুদী ছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে যান। হযরত ফারূকে আযম (রা) একবার তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে বলেন যে, তোমরা আমাদের পয়গম্বরকে এমন চেন, যেমন নিজ সন্তানদেরকে চেন---এরূপ বলার কারণ কি ? আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন ঃ হ্যাঁ, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণিত গুণাবলীর দ্বারাই চিনি, যা তওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই আমাদের এ জ্ঞান অকাট্য ও সুনিশ্চিত। নিজ সন্তানরা এরূপ নয়। তাদের পরিচয়ে সন্দেহ হতে পারে যে, আমাদের সন্তান কি না।

হযরত যায়েদ ইবনে সা'না (রা) আহলে-কিতাবদের একজন ছিলেন। তিনি তওরাত ও ইঞ্জীলের বর্ণনার মাধ্যমেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনেছিলেন। শুধু একটি মাত্র গুণের সত্যতা তিনি পূর্বে জানতে পারেন নি। পরীক্ষার পর তাও জানতে পারেন। তা হল এই যে, তাঁর সহনশীলতা ক্রোধের উপর প্রবল হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ গুণটিও তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান দেখতে পান। অতঃপর কালবিলম্ব না করে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ আহলে-কিতাবরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পূর্ণরূপে চেনা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে না। এভাবে তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ

كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا

مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا
بِهَا ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ
اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

(২২) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, অতঃপর যারা শিরক করেছিল, তাদেরকে বলব ঃ যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায় ? (২৩) অতঃপর তাদের কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না ; তবে এটুকুই যে, তারা বলবে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখ তো, কিভাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে ? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছেমিছি রটনা করত, তা সবই উধাও হয়ে গেছে। (২৫) তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফিররা বলে ঃ এটি পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী বৈ তো নয়। (২৬) তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। অথচ তারা কেবল নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, কিন্তু বুঝছে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সে সময়টিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সব সৃষ্ট জগতকে (হাশরের ময়দানে) একত্র করব। অতঃপর আমি মুশরিকদের (পরোক্ষভাবে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে, তিরস্কৃত করার জন্য) বলব ঃ (বল,) যে অংশীদারদের উপাস্য হওয়ার দাবী তোমরা করতে, এখন তারা কোথায়? (তোমরা তো তাদের সুপারিশের ভরসা করতে, তারা সুপারিশ করে না কেন?) অতঃপর তাদের শিরকের পরিণাম এছাড়া কিছুই (জাহির) হবে না যে, তারা (এ শিরক থেকে নিজেরাই বিমুখতা ও ঘৃণা প্রকাশ করবে এবং হতবুদ্ধি হয়ে) বলবে ঃ আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে) দেখ তো কিভাবে (প্রকাশ্যে) এরা মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে! এবং যেসব বস্তু তারা মিছেমিছি তৈরী করত (অর্থাৎ মূর্তি এবং যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির

করত) তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে (কোরআন অস্বীকারের নিন্দা— وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ

إِلَيْكَ) আর তাদের (মুশরিকদের) মধ্যে কেউ কেউ (আপনার কোরআন পাঠের সময় তা শোনার জন্য) আপনার দিকে কান লাগায় (কিন্তু তাদের এ শোনা সত্যান্বেষণের জন্য নয়, বরং শুধু তামাশা ও বিদ্রূপের নিয়তে হতো। তাই এতদ্বারা তাদের কোন উপকার হতো না। সেমতে) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে করে তারা একে (অর্থাৎ কোরআনের উদ্দেশ্যকে) না বুঝে এবং তাদের কর্ণসমূহে বোঝা ভরে দিয়েছি (অর্থাৎ তারা একে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে শোনে না। এ হচ্ছে তাদের অন্তর ও কর্ণের অবস্থা। এখন তাদের জ্ঞানচক্ষুকে ও চর্মচক্ষুকে দেখ) যদি তারা (আপনার নবুয়তের সত্যতার) সব যুক্তি-প্রমাণ (গুলোও) অবলোকন করে, তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। (তাদের হঠকারিতা) এতদূর (পৌঁছেছে) যে, যখন তারা আপনার সাথে অনর্থক বিসম্বাদ করে (এভাবে যে,) যারা কাফির তারা বলে ঃ এটি তো (অর্থাৎ কোরআন) কিছুই নয়— শুধু ভিত্তিহীন কথাবার্তা যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে (বর্ণিত) চলে এসেছে। (অর্থাৎ ধর্মাবলম্বীরা প্রাচীন কাল থেকেই এ ধরনের কথাবার্তা বলে এসেছে যে, উপাস্য একজনই এবং মানুষ আল্লাহ্র পয়গম্বর হতে পারে। 'কিয়ামতে পুনর্জীবন লাভ করতে হবে না' এর সারমর্ম হঠকারিতা ও অসত্যারোপ। পরে তা উন্নত হয়ে অবিশ্বাসের রূপ নেয় এবং অপরকেও হেদায়েত থেকে বাধা দিতে শুরু করে) অতঃপর তারা এ (কোরআন) থেকে অপরকেও বাধা দেয় এবং নিজেরাও (এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশার্থে) দূরে দূরে থাকে এবং (এসব কাণ্ড করে) তারা নিজেদেরকেই বিনষ্ট করছে (বোকামি ও শত্রুতাবশত) কিন্তু বুঝে না (যে, তারা কার ক্ষতি করছে? তাদের এ কর্ম দ্বারা রসূল ও কোরআনের কোন ক্ষতি হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফিররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে ঃ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

جَمِيعًا —অর্থাৎ ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও তাদের তৈরী করা উপাস্যসমূহকে একত্র করব। ثُمَّ نَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ —অর্থাৎ অতঃপর. আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?

এখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে বোঝা যায় যে, হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না, বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক-কাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন: তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্র করবেন যেমন তীরসমূহকে তূণীরে একত্রিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে পারবে না। —(মুস্তাদরাক, বায়হাকী)

উপরোক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কোরআন পাকের দুই আয়াতেও উল্লিখিত রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে: كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ —অর্থাৎ ঐ দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে। إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ এক দিন তোমার পালন-কর্তার কাছে এক হাজার বছরের মত হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হবে। তাই কারও কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

সার কথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমত দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনরূপ পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক—পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো দূর হবে! এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ثُمَّ শব্দ প্রয়োগ করে ثُمَّ نَقُولُ বলা হয়েছে। এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়েছে, তাতেও ثُمَّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে এ

উত্তর দেবে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ---অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فِتْنَةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কারও প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবী করে বসল।

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থ্যের অভাবনীয় ঘটনাবলী দেখার পর তারা কোন্ সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল! তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহ্র মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

অধিকাংশ তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন ঃ তাদের এ উত্তর বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণাম-দর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন যেন তারা পৃথিবীর মত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক---যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা-ভাষণে অদ্বিতীয় পটু; এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কোরআন পাকের অপর এক আয়াতে وَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না।

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শেরেকী ও কুফরী অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে নির্দেশ দেবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করত! তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ---এরা সবাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

অর্থাৎ' অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।'

এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথ্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا —অর্থাৎ ঐদিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে কোন কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এর অর্থ এই-ই যে, প্রথম তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না।

মহা-বিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার মিথ্যা আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দেবেন।

মৃত্যুর পর কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুনকার-নাকীর যখন কাফিরকে জিজ্ঞেস করবে, من ربك وما دينك —অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা কে এবং তোমার দীন কি? কাফির বলবে, هاه هاه لا ادرى অর্থাৎ হায়, হায়! আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মু'মিন বলবে, ربى الله ودينى الاسلام —আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ এবং আমার দীন ইসলাম। এতে বোঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফিরও মু'মিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারত। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করত। ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না।

তফসীর 'বাহ্‌রে-মুহীত' ও 'মাযহারী'তে কোন কোন তফসীরবিদের এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোন সৃষ্ট জীবকে খোলাখুলি আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না বললেও আল্লাহ্‌র সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবে বন্টন করে দিয়েছিল। সৃষ্ট জীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাচনা করত, তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুযী-রোযগার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করত। তারা নিজেদেরকে মুশরিক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরিক ছিল না। কিন্তু কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোরআনের কোন কোন আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও গোনাহ্গারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন।

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসাবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ—এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলছে ; আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরীক তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরী করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরীক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরীর অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন ঃ মনগড়া তৈরী করা বলে মুশরিকদের ঐসব অপব্যাখ্যা বোঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করত। উদাহরণত তারা বলত ঃ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى —অর্থাৎ আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

এখানে প্রশ্ন হয়, আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যখন এ প্রশ্ন ও উত্তর হবে, তখন মিথ্যা উপাস্যরা উধাও হয়ে থাকবে, কেউ সামনে থাকবে না। কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ - অর্থাৎ কিয়ামতে আল্লাহ্ নির্দেশ দেবেন, অত্যাচারীদের, তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের এবং তারা যাদের উপাসনা করত, সবাইকে একত্র কর। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা উপাস্যরাও হাশরে উপস্থিত থাকবে।

উত্তর এই যে, আয়াতে তাদের উধাও হওয়ার অর্থ অংশীদার কিংবা সুপারিশকারী হিসাবে তারা অনুপস্থিত থাকবে। অর্থাৎ অংশীবাদীদের কোন উপকারই তারা করতে পারবে না, বরং এমনিতেই সেখানে উপস্থিত থাকবে। এভাবে উভয় আয়াতে কোনরূপ গরমিল থাকে না। একথা বলাও সম্ভব যে, এক সময়ে তাদেরকে একত্র করা হবে এবং পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উপরোক্ত প্রশ্ন করা হবে।

উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদের যা ইচ্ছা বলার স্বাধীনতা দানের মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে মিথ্যা বলার নিন্দা জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে।—(ইবনে হাব্বান)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ যে কাজের দরুন মানুষ দোযখে যাবে, তা কি? তিনি বললেন ঃ সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা।—(মসনদে-আহমদ) মি'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি কে? জিবরাঈল বললেন ঃ এ হল মিথ্যাবাদী।

মসনদে আহমদের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না। এমনকি, হাসি-ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত।

বায়হাকীতে সহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কু-অভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিযিক কমিয়ে দেয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ---যাহ্হাক, কাতাদাহ্, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে এ আয়াত মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কোরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী (সা)-র চাচা আবূ তালিব ও আরও কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় عَنْهُ শব্দের সর্বনামটির অর্থ কোরআনের পরিবর্তে নবী করীম (সা) হবেন।—(মাযহারী)

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ
رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن
قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ
إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ
رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ
بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ
ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ
أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ
إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

(২৭) আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদের দোযখের উপর দাঁড় করানো হবে! তারা বলবেঃ কতই না ভাল হত, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত হতাম; তা হলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। (২৮) এবং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) তারা বলেঃ আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদের পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৩০) আর যদি আপনি দেখেন; যখন তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বললেনঃ এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবেঃ হ্যাঁ, আমাদের পালনকর্তার কসম। তিনি বলবেনঃ অতএব স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর। (৩১) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি! তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা। (৩২) পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহিযগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি আপনি (তাদের) তখন দেখেন, (তবে ভয়ংকর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে—) যখন তাদের (অবিশ্বাসীদের) দোযখের উপরে দাঁড় করানো হবে (এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কাছাকাছি অবস্থায় থাকবে) তারা (শত সহস্র আকাঙ্ক্ষার সাথে) বলবে হায়, কতই না ভাল হত, যদি আমরা দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরিত হতাম। আর এরূপ হয়ে গেলে আমরা (পুনরায়) স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে (কোরআন ইত্যাদিতে) কখনও মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা (অবশ্যই) বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের এ আকাঙ্ক্ষা ও ওয়াদা সত্যিকার আগ্রহ ও আনুগত্যের ইচ্ছাপ্রসূত নয়) বরং (এখন তারা একটি বিপদে জড়িত হচ্ছে যে,) যা তারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) গোপন (ও নিশ্চিহ্ন) করত, তা আজ তাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। এর অর্থ পরকালের সে শাস্তি, কুফর ও অবাধ্যতার কারণে যার হুমকি দুনিয়াতে তাদেরকে দেওয়া হত। গোপন করার অর্থ অস্বীকার করা। মর্মার্থ এই যে, এখন তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হয়েছে। তাই প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে এসব ওয়াদা করা হচ্ছে। ওয়াদা পূর্ণ করার আন্তরিক ইচ্ছা মোটেই নেই। এমনকি,) যদি (ধরে নেওয়া যায়) তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে তাই করবে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল (অর্থাৎ কুফর ও অবাধ্যতা) এবং নিশ্চয় তারা (এসব ওয়াদায়) সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী (অর্থাৎ ওয়াদা পূরণের ইচ্ছা এখনও নেই এবং দুনিয়াতে গিয়েও এর সম্ভাবনা নেই) এবং (এরা একমাত্র অবিশ্বাসীরা) বলেঃ জীবন আর কোথাও নেই; এ পার্থিব জীবনই জীবন। (এ জীবন শেষ হওয়ার পর পুনরায়) আমরা উত্থিত হব না (যেমন নবী রসূলরা বলেন)। আর যদি আপনি (তাদেরকে) তখন দেখেন, (তবে বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করবেন---) যখন তাদের স্বীয় পালনকর্তার সামনে হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ (বল) এটা (কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হওয়া) কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবেঃ নিঃসন্দেহে (বাস্তব), আমাদের পালনকর্তার কসম। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ অতএব স্বীয় কুফরের স্বাদ গ্রহণ কর। (এরপর তাদেরকে দোযখে পাঠিয়ে দেওয়া হবে) নিশ্চয় তারা (অত্যন্ত) ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাতকে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে জীবিত হয়ে আল্লাহ্র সামনে পেশ হওয়াকে) মিথ্যা বলে (এ মিথ্যা বলা অল্পদিন স্থায়ী হবে)। এমনকি, যখন সেই নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন লক্ষণাদিসহ) তাদের কাছে অকস্মাৎ (বিনা নোটিশে) উপস্থিত হবে, (তখন সব গালভরা বুলি ও মিথ্যা বলা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং) তারা বলবেঃ এর (কিয়ামতের) সম্পর্কে আমরা যে ত্রুটি (ও অবহেলা) করেছি সে জন্য আফসোস! এবং তারা স্বীয় (কুফর ও অবাধ্যতার) বোঝা নিজ পিঠে বহন করবে। কান খুলে শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে তা নিকৃষ্টতর। আর এ পার্থিব জীবন (অনুপকারী ও অস্থায়ী হওয়ার কারণে) ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয় এবং পরলোকের আবাস পরহিযগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি চিন্তা কর না?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে---১. একত্ববাদ, ২. রিসালত ও ৩ আখিরাতে

বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যত এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কোরআন পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অশেষ সওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ পরকালে যখন তাদেরকে দোযখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস! আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তার প্রেরিত নিদর্শনাবলী ও নির্দেশাবলীতে মিথ্যারোপ করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহ্বল আকাঙ্ক্ষার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন ঃ এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙ্ক্ষায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপার এই যে, পয়গম্বরদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ সেগুলি একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ্ পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও শক্তি-সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গম্বরদের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া যা সব সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে তা সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোযখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার কোন ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ তারা যে ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না ; তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্য বলছে ---অন্তরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ---এর عطف হয়েছে عَادُوْا -এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে

পৌঁছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না, এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে এবং হিসাব-কিতাব, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর ?

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্য বাস্তবে ঘটনাবলীর বিশ্বাস না থাকা জরুরী নয়। বরং আজকাল যেমন অনেক কাফির ইসলামী সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতাবশত ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কোরআন পাক বর্তমান জীবনে কোন কোন কাফির সম্পর্কে বলে ঃ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ---অর্থাৎ তারা নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী (সা)-কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে-পড়ে লেগে আছে।

মোট কথা, জগৎস্রষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে 'দুনিয়াতে পুন প্রেরিত হলে মু'মিন হয়ে যাব'---সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তাদের কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত।

তফসীরে মাযহারীতে তিবরানীর বরাত দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বিচার দণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন ঃ সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি বেশী হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌঁছাতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলবেন ঃ আমি জাহান্নামের আযাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুন প্রেরিত হলেও সে পূর্বের মতই কাজ করবে।

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ — হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সৎ লোকদের কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজকর্ম ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কাফির ও পাপীরা হাশরের ময়দানে প্রাণ রক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা বলবে। কখনও মিথ্যা কসম খাবে, কখনও দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা

এখন বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এখন সৎকাজ করব। কেননা, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে যে, এ জগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্বাস স্থাপন ততক্ষণ পর্যন্তই শুদ্ধ, যতক্ষণ তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন হয়। দেখার পর সত্য জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া----আল্লাহ্ ও রসূলকে সত্য জানা নয়। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, এর ফলাফল অর্থাৎ চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ, দুনিয়াতে শান্তিময় পবিত্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত লাভ শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পূর্বে আত্মজগতে এগুলো অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর পরে পরকালেও এগুলো উপার্জন করা সম্ভবপর নয়।

এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নিয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। উপরোক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। কারণ, এতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিরাট নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তির জীবনালেখ্যে দেখা যায় যে, ওফাতের সময় তাঁদের মুখে হযরত জামীর এ পংক্তিটি উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

با دو روزِ زندگی جامی نشد سیر غمت -
وہ چہ خوش بودے کہ عمرِ جاودانی داشتیم

এতে একথাও ফুটে উঠেছে যে, আলোচ্য শেষ আয়াতে এবং কোরআন পাকের আরও কতিপয় আয়াতে পার্থিব জীবনকে যে ক্রীড়া ও কৌতুক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কিংবা অনেক হাদীসে দুনিয়ার যে নিন্দা বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ---পার্থিব জীবনের ঐসব মুহূর্ত, যা আল্লাহ্র স্মরণ ও চিন্তা থেকে গাফিল অবস্থায় অতিবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে সময় আল্লাহ্র ইবাদত ও স্মরণে অতিবাহিত হয়, তার সমতুল্য পৃথিবীর কোন নিয়ামত ও সম্পদই নেই।---

دن وھی دن ھے شب وھی شب ھے
جو تری یاد میں گذر جائے

এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ الدنیا ملعون وملعون ما فیها الا ذکر الله او عالم او متعلم অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছুই অভিশপ্ত কেবল আল্লাহ্র স্মরণ এবং আলিম কিংবা তালিবে ইল্ম বাদে।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আলিম ও তালিবে ইল্মও আল্লাহ্র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ইল্ম দ্বারা হাদীসে ঐ ইল্ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণ হয়। এমন ইল্ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া উভয়ই আল্লাহর স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম জযরীর বর্ণনা মতে---দুনিয়ার যে কোন কাজই আল্লাহ্র আনুগত্য অর্থাৎ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী করা হয়, তা আল্লাহ্র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। এতে বোঝা যায় যে, দুনিয়ার সব জরুরী কাজ, জীবিকা উপার্জনের যাবতীয় বৈধ পন্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনাদি শরীয়তের সীমার বাইরে না হলে সবই আল্লাহ্র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব,

প্রতিবেশী, মেহমান ইত্যাদির প্রাপ্য পরিশোধ করাকে সহীহ্ হাদীসে সদ্‌কা ও ইবাদত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মোট কথা এই যে, এ জগতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য এবং স্মরণ ছাড়া কোন কিছুই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র) চমৎকার বলেছেন ঃ

بگذر از یادِ گل وگلبن که هیچم یاد نیست
در زمین وآسماں جز ذکرِ حق آباد نیست

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। একথাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক সীমা কারও জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে না, সত্তর ঘন্টা, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবে না।

অপরদিকে এ কথাও জানা যে, ইহকাল ও পরকালের সুখশান্তি ও আরাম-আয়েশের নিশ্চয়তা বিধায়ক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরূপী অমূল্য মূলধনটি একমাত্র এ সীমাবদ্ধ পার্থিব জীবনেই অর্জন করা যায়। এখন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ নিজের ফয়সালা করতে পারে যে, জীবনের এ সীমাবদ্ধ মুহূর্তগুলোকে কি কাজে ব্যয় করা যায়? নিঃসন্দেহে বুদ্ধির দাবীও এই হবে যে, এ মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের কাজেই অধিকতর ব্যয় করা দরকার। জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ যতটুকু করা নেহায়েত জরুরী, ততটুকুই করা উচিত।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

الكيس من دان نفسه ورضى بالكفاف وعمل لما بعد الموت

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিই বুদ্ধিমান ও চতুর, যে আত্মসমালোচনা করে, ন্যূনতম জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ
فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ
اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ
اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ

فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ
ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ
وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۚ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ
اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

(৩৩) আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, প্রকারান্তরে এ জালিমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকেই অস্বীকার করে। (৩৪) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে। (৩৫) আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর তাদের কাছে কোন একটি মো'জেযা আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব, আপনি অবুঝদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৩৬) তারাই মানে, যারা শ্রবণ করে। আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করে উত্থিত করবেন। অতঃপর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৭) তারা বলে: তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিনঃ আল্লাহ্ নিদর্শন অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩৮) আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে

বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় পালনকর্তার কাছে সমবেত হবে। (৩৯) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (৪০) বলুন, বল তো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যাকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও ? (৪১) বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্য তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিরদের বাজে কথার প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দান ঃ আমার ভাল জানা আছে যে, তাদের (কাফিরদের) উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব (আপনি দুঃখিত হবেন না, বরং তাদের ব্যাপার আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করুন কেননা) তারা সরাসরি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না। কিন্তু জালিমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী (ইচ্ছাকৃতভাবে) অস্বীকার করে (যদিও এতে অপরিহার্যভাবে আপনাকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যারোপ করা। যেমন, তাদের কেউ কেউ অর্থাৎ আবু জাহল প্রমুখ এ কথা স্বীকারও করে। তাদের আসল উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তখন বুঝতে হবে যে, তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্র সাথেই সম্পৃক্ত। তিনি নিজেই তাদেরকে বুঝে নেবেন। আপনি দুঃখিত হবেন কেন ?) আর (কাফিরদের এ মিথ্যারোপ করার ব্যাপারটি নতুন কিছু নয়, বরং) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরের প্রতিও মিথ্যারোপ করা হয়েছে, আর এ মিথ্যারোপের জবাবে তাঁরা ধৈর্যই ধরেছিলেন এবং তাঁদের উপর (নানাবিধ) নির্যাতন চালানো হয়---এমনকি তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে যায়। (ফলে বিরোধী পক্ষ পরাজিত হয়--তখন পর্যন্ত তাঁরা ধৈর্যই ধরেছিলেন।) এবং (এমনিভাবে ধৈর্য ধরার পর আপনার কাছেও আল্লাহ্র সাহায্য পৌঁছবে। কেননা) আল্লাহ্র বাণী (অর্থাৎ ওয়াদাসমূহ)-কে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (আপনার সাথেও সাহায্যের ওয়াদা হয়ে গেছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ এবং) আপনার কাছে পয়গম্বরদের কোন কোন কাহিনীর (কোরআনের বাহির) মাধ্যমে পৌঁছেছে (যদ্দ্বারা আল্লাহ্র সাহায্য এবং পরিণামে বিরোধী পক্ষের পরাজয় প্রমাণিত হয়। এ সান্ত্বনার সারমর্ম এই যে, প্রথম প্রথম কয়েকদিন ধৈর্য ধারণের পর আল্লাহ্ পয়গম্বরদের কাছে সাহায্য প্রেরণ করেন---এটি আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা। এ সাহায্যের ফলে ইহকালেও সত্য জয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হয়ে যায় এবং পরকালেও তাঁরা সম্মান ও সাফল্য লাভ করেন। আপনার সাথেও এ ব্যবহারই করা হবে। কাজেই আপনি দুঃখিত হবেন না। যেহেতু সব মানুষের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চূড়ান্ত দয়া ও ভালবাসা ছিল তাই এ সান্ত্বনা সত্ত্বেও তাঁর বাসনা ছিল যে, মুশরিকরা বর্তমান মো'জেযা ও নবুয়তের প্রমাণাদিতে আশ্বস্ত হয়ে বিশ্বাস স্থাপন

না করলে তারা যেরূপ মো'জেযা দাবী করে, তদ্রূপ মো'জেযাই প্রকাশ করা হোক---এতে হয়তো তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। এদিক দিয়ে তাদের কুফরী দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) ধৈর্য ধারণ করতে পারতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র হিকমত অনুযায়ীই ফরমায়েশকৃত মো'জেযা প্রকাশ করা হবে না। আপনি কিছু-দিন ধৈর্য ধরুন, মো'জেযা প্রকাশের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। সেমতে বলা হয়েছে ঃ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ) এবং যদি তাদের (অবিশ্বাসীদের) বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয় (এবং তাই মনে চায় যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মো'জেযা প্রকাশিত হোক) তবে আপনি যদি ভূতলে (যাওয়ার জন্য) কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে ওঠার জন্য কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন এবং (তার দ্বারা ভূতলে কিংবা আকাশে গিয়ে সেখান থেকে) কোন একটি (ফরমায়েশী) মো'জেযা আনতে পারেন, তবে (ভাল কথা, আপনি তাই) আনুন। (অর্থাৎ আমি তো তাদের এসব ফরমায়েশ প্রয়োজন ও হিকমত অনুযায়ী না হওয়ার কারণে পূর্ণ করব না। আপনি যদি চান যে, তাঁরা কোন-না-কোনরূপে মুসলমান হোক, তবে আপনি নিজে এর ব্যবস্থা করুন।) আর আল্লাহ্ (সৃষ্টিগতভাবে) ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে সৎপথে একত্র করতেন, (কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গল চায় না, তাই সৃষ্টি-গতভাবে আল্লাহ্ তা ইচ্ছা করেন নি। এমতাবস্থায় আপনার চাওয়া ঠিক হবে না।) অতএব, আপনি (এ চিন্তা পরিহার করুন); অবুঝদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (সত্য ও হিদায়তকে তো) তারাই গ্রহণ করে যারা (সত্য বিষয়কে অনুসন্ধিৎসার সাথে) শ্রবণ করে এবং (এ অস্বীকার ও বিমুখতার পূর্ণ শাস্তি ইহকালে না পেলে তাতে কি হল, একদিন আল্লাহ্) মৃত-দেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করবেন, অতঃপর তারা সবাই আল্লাহ্রই দিকে (হিসাবের জন্য) প্রত্যাবর্তিত হবে। আর তারা (অবিশ্বাসীরা হঠকারিতা করে) বলে যে, যদি তিনি নবী হন, তবে তাঁর প্রতি (আমাদের ফরমায়েশকৃত মো'জেযার মধ্য থেকে) কোন মো'জেযা কেন অবতীর্ণ করা হয়নি? আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা (এরূপ) মো'জেযা অবতরণ করতে পূর্ণ শক্তিমান, কিন্তু তাদের অধিকাংশই (এর পরিণাম সম্পর্কে) অবগত নয়। (তাই এরূপ আবেদন করছে। পরিণাম এই যে, এর পরেও বিশ্বাস স্থাপন না করলে কালবিলম্ব না করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। প্রমাণ ঃ ولو انزلنا ملكا لقضى الامر সারকথা এই যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মো'জেযা প্রকাশ করার প্রয়োজন এ জন্য নেই যে, পূর্বের মো'জেযাগুলোই যথেষ্ট। আল্লাহ্ বলেন ঃ اولم يكفهم এ ছাড়া আমি জানি যে, ফরমায়েশকৃত মো'জেযা দেখেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ফলে তাৎক্ষণিক শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। তাই হিকমতের দাবী এই যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মো'জেযা প্রকাশ না করা হোক। ভালবাসা ও দয়াবশত আয়াতের শেষ ভাগে وَلَا تَكُونَنَّ

مِنَ الْجٰهِلِيْنَ বলা হয়েছে جهالت (মূর্খতা) শব্দটি আরবী ভাষায় অবুঝ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর অনুবাদে 'অজ্ঞতা' কিংবা 'অজ্ঞানতা' বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থী। (পরবর্তী আয়াতে হুঁশিয়ার করার জন্য কিয়ামত ও সব সৃষ্ট জীবের হাশর বর্ণিত হচ্ছে---) এবং যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে (স্থলে হোক কিংবা জলে) বিচরণশীল রয়েছে, যত প্রকার পাখী দু'ডানা যোগে উড়ে বেড়ায় তাদের মধ্যে কোন প্রকারই এরূপ নেই, যা (কিয়ামতের দিন জীবিত ও উত্থিত হওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের মত সম্প্রদায় নয় এবং (যদিও এগুলোর সংখ্যাধিক্যের কারণে সাধারণভাবে অগণিত মনে করা হয়, কিন্তু আমার হিসাবে সব লিপিবদ্ধ আছে। কেননা) আমি (স্বীয়) গ্রন্থে (লওহে মাহফুযে) কোন বস্তু (যা কিয়ামত পর্যন্ত হবে, না-লিখে) ছাড়িনি। (যদিও আল্লাহ্‌র পক্ষে লেখার প্রয়োজন ছিল না---তাঁর আদি ও সর্বব্যাপী জ্ঞানই যথেষ্ট, কিন্তু সাধারণকে বোঝাবার জন্য লিপিবদ্ধ করে নেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত।) অনন্তর (এর পরে নির্দিষ্ট সময়ে) সবই (মানুষ ও জন্তু জানোয়ার) স্বীয় পালনকর্তার কাছে একত্র হবে। [অতঃপর পুনরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে] যারা আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করে, তারা তো (সত্য বলার ব্যাপারে) মূক (সদৃশ) এবং (সত্য শ্রবণে) বধির (সদৃশ) হচ্ছে (এবং এর কারণে) নানারূপ অন্ধকারে (পতিত) রয়েছে। (কেননা, প্রত্যেকটি কুফর এক একটি অন্ধকার। তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কুফরী একত্র রয়েছে। এরপর বিভিন্ন প্রকার কুফরীর বারবার পুনরাবৃত্তি পৃথক পৃথক অন্ধকারের সমাবেশ ঘটিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, (সত্যবিমুখ হওয়ার কারণে) পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা. (কৃপাবশত) সরল পথে পরিচালিত করেন। আপনি (মুশরিকদের) বলুনঃ (আচ্ছা) বল তো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র কোন শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায় তবে কি (এ শাস্তি ও কিয়ামতের ভয়াবহতা দূরীকরণার্থ) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করবে?--- যদি তোমরা (শিরকের দাবীতে) সত্যবাদী হও! (সত্যবাদী হলে তখনও অন্যকেই আহ্বান কর, কিন্তু এরূপ কখনও হবে না) বরং (তখন তো) বিশেষভাবে তাঁকেই আহ্বান করবে। অতঃপর যার (অর্থাৎ যে বিপদ টলানোর) জন্য তোমরা (তাঁকে) আহ্বান করবে তিনি ইচ্ছা করলে হটাবেন না এবং যাদেরকে তোমরা (এখন আল্লাহ্‌র) অংশীদার করছ (তখন) তাদের সবাইকে ভুলে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ অর্থাৎ কাফিররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে। সুদ্দীর বর্ণনাসূত্রে তফসীরে মাযহারীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দু'জন কাফির সর্দার আখনাস ইবনে শরীফ ও আবূ জাহলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবূ জাহলকে জিজ্ঞেস করলঃ হে আবুল হিকাম! [আরবে

আবূ জাহল 'আবুল হিকাম' (জ্ঞানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলাম যুগে কুফরী ও হঠকারিতার কারণে তাকে 'আবূ জাহল' (মূর্খতাধর) উপাধি দেওয়া হয়।] আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না; মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি, আমাকে সত্য সত্য বল। তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী?

আবূ জাহল আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলল: নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেন নি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কোরায়শ গোত্রের একটি শাখা 'বনী কুসাই'-এ সব গৌরব ও মহত্ত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কোরায়শরা রিক্তহস্ত থেকে যাবে---আমরা তা কিরূপে সহ্য করতে পারি? পতাকা বনী কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হেরেম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। খানায়ে-কা'বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুয়তও তাদের মধ্যেই ছেড়ে দিই, তবে অবশিষ্ট কোরায়শদের হাতে কি থাকবে?

নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার আবূ জাহল স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল: আপনি মিথ্যাবাদী ---এরূপ কোন ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ ধর্ম ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন।---(মাযহারী)

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেওয়া যেতে পারে, কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কাফিররা আপনাকে নয়---আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফিররা বাহ্যত যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে ও তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কেই কষ্ট দেয়।

ষষ্ঠ আয়াতে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেওয়া হবে। যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে: 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়ই কাফিররা আক্ষেপ করে বলবে: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا --অর্থাৎ আফসোস, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম।

ইমাম বগভী হযরত আবূ হোরায়রার রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমনকি, শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেওয়া হবে।

সৃষ্ট জীবের পাওনার গুরুত্ব ঃ সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোন শরীয়ত ও বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেওয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জ্বীনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলিমরা বলেন ঃ হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং রাব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেওয়া হবে। তাদের অন্য কোন কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বোঝা যায় যায় যে, সৃষ্ট জীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়—এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক ও ইবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنٰهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلٰكِن
قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا
ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
أَخَذْنٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٤٥﴾

(৪২) আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। (৪৩) অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব এল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। (৪৪) অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। (৪৫) অতঃপর জালিমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম (কিন্তু তারা তাঁদেরকে অমান্য করে) অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন মাধ্যমে পাকড়াও করেছিলাম---যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে (এবং কুফর ও গোনাহ্ থেকে তওবা করে নেয়)। অতএব তাদের কাছে যখন আমার শাস্তি পৌঁছেছিল, তখন কেন তারা কাকুতি-মিনতি করেনি (যাতে তাদের অপরাধ মাফ হয়ে যেত) ? পরন্তু তাদের অন্তর তো (তেমনি) কঠোরই রয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কুকর্মসমূহকে তাদের ধারণায় (যথারীতি) সুশোভিত (ও প্রশংসার্হ) করে দেখাতে থাকে। অনন্তর যখন তারা (যথারীতি) উপদেশ বিস্মৃত হল (এবং পরিত্যাগ করল) যা তাদেরকে (পয়গম্বরদের পক্ষ থেকে) দেওয়া হত (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য) তখন আমি তাদের জন্য (আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের) সব দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়সমূহের জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল (এবং) অমনোযোগিতা ও শৈথিল্যবশত তাদেরকে অকস্মাৎ (ধারণাতীত আযাবে) পাকড়াও করলাম (এবং কঠোর আযাব নাযিল করলাম, যা কোরআনের স্থানে স্থানে বর্ণিত হয়েছে,) অতঃপর (এ আযাব দ্বারা) জালিমদের মূল শিকড় (পর্যন্ত) কর্তিত হয়ে গেল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা (অর্থাৎ যে জালিমদের কারণে জগতে অমঙ্গল ছড়িয়েছিল, তাদের পাপছায়া দূর হয়ে গেল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল করে একত্ববাদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মক্কার মুশরিকদের প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ যদি আজ তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে ---উদাহরণত আল্লাহ্‌র আযাব যদি দুনিয়াতেই তোমাদের পাকড়াও করে কিংবা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, তবে চিন্তা করে বল, তোমরা এ বিপদ দূর করার জন্য কাকে ডাকবে ? কার কাছে বিপদ-মুক্তির আশা করবে ? পাথরের এসব স্বনির্মিত মূর্তি কিংবা কোন সৃষ্ট জীব, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র মর্যাদায় আসীন করে রেখেছ, তারা তোমাদের কাজে আসবে কি ? তোমরা তাদের কাছে ফরিয়াদ করবে, না শুধু আল্লাহ্ তা'আলাকেই আহ্বান করবে ?

এর উত্তর যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এছাড়া কিছুই হতে পারে না, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ ব্যাপক বিপদমুহূর্তে কট্টর মুশরিকই সব মূর্তি ও স্বনির্মিত উপাস্যদের ভুলে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই আহ্বান করবে। এখন ফলাফল সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মূর্তি এবং ঐ উপাস্য, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব মোচনকারী মনে করছ, তারা যখন এ বিপদ মুহূর্তে তোমাদের কাজে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের জন্য তাদেরকে আহ্বান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের ইবাদত কোন্ উপকারে আসবে ?

এ বিষয়টি হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম। এসব আয়াতে কুফর, শিরক ও

অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ পার্থিব জীবনেও আযাব আসার সম্ভাব্যতা বর্ণিত হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, যদি এ জীবনে আযাব নাও আসে, তবে কিয়ামতের আগমন তো অবশ্যম্ভাবী। সেখানে মানুষের সব কাজ কর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রতিদান এবং শাস্তির বিধানও জারি হবে।

এখানে ساعة শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ কিয়ামতও হতে পারে এবং 'কিয়ামতে ছুগরা' (ছোট কিয়ামত)-ও হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুতেই এ কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়। প্রবাদবাক্য আছে ঃ من مات فقد قامت قيامته অর্থাৎ যার মৃত্যু হয়, তার কিয়ামত সেদিনই হয়ে যায়। কেননা, কিয়ামতের হিসাব-কিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর ও বরযখে দেখা যাবে এবং প্রতিদান এবং শাস্তির নমুনাও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

সারকথা এই যে, অবাধ্যদেরকে এসব আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে না যায়। পার্থিব জীবনেও তারা আযাবে পতিত হতে পারে---যেমন, পূর্ববর্তী উম্মতরা হয়েছে। যদি তা না হয়, তবে মৃত্যু কিংবা কিয়ামতে পরবর্তী হিসাব তো অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু যে মানব সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্র বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে, তারা এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে বাহানাবাজির আশ্রয় নেয়। তারা পয়গম্বরদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণীকে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা বাঁচিয়ে যায়। বিশেষ করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্যতা সত্ত্বেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও সম্মান মর্যাদা সব কিছুই তাদের করায়ত্ত রয়েছে। একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অপরদিকে পয়গম্বরগণের ভীতি-প্রদর্শন---যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহানাবাজ মন ও শয়তান তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, পয়গম্বরগণের উক্তি একটি প্রতারণা ও কুসংস্কারপ্রসূত ধারণা বৈ নয়।

এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত আইন বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ -

অর্থাৎ আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো এবং আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরও বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হল। অর্থাৎ তাদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেওয়া হল এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হল। আশা ছিল যে, তারা এ সব

নিয়ামত দেখে নিয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হল। নিয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ্ ও রসূলের বাণী ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওযর-আপত্তির আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে মিসমার করে দিয়েছে। নূহ (আ)-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। 'আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যুপরি আট দিন প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামূদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। লূত (আ)-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টিয়ে দেওয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'বাহরে-মাইয়্যেৎ' তথা 'মৃত-সাগর' নামে এবং 'বাহ্‌রে-লূত' নামেও অভিহিত করা হয়।

মোটকথা পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে—যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোন সময় তারা বাহ্যত স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোন জাতির প্রতি অকস্মাৎ আযাব নাযিল করেন না, বরং প্রথমে হুঁশিয়ারির জন্য অল্প শাস্তি অবতারণ করেন। এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। আরও জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসাবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়, বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ করুণা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থাৎ আমি তাদেরকে বড় আযাবের স্বাদ গ্রহণ করানোর পূর্বে একটি ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাই, যাতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসে।

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়, বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভালমন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয়; বরং অসৎ লোক সৎ লোকের চাইতে অধিক সুখে থাকে। অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আসল প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতেই হবে। তাই কিয়ামতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্দীন' প্রতিদান দিবস। কিন্তু আযাবের নমুনা হিসাবে কিছু কষ্ট

এবং সওয়াবের নমুনা হিসাবে কিছু সুখ করুণাবশত ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোন কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোন কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

মোট কথা, দুনিয়ার সুখ ও কষ্ট প্রকৃত শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং শাস্তি ও প্রতিদানের নমুনা মাত্র। সমগ্র বিশ্বজগৎ পরকালের একটি শো-রুম। ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের নমুনা দেখাবার জন্য দোকানের অগ্রভাগে একটি শো-রুম সাজিয়ে রাখে, যাতে নমুনা দেখে ক্রেতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব, বোঝা গেল যে, দুনিয়ার কষ্ট ও সুখ প্রকৃতপক্ষে শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল মাত্র।

خلق را با تو چنیں بد خو کنند
تا ترا ناچار روان سو کنند

আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। এতে বোঝা গেল যে, দুনিয়াতে আযাব হিসাবেও যে কষ্ট ও বিপদ কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রহমত কার্যরত থাকে।

এরপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

এতে সাধারণ মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে রয়েছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে।

তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তি'র উপর নিয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, অথচ সে গোনাহ্ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে,

তাকে ঢিলা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস।---(ইবনে-কাসীর)

তফসীরবিদ ইবনে-জারীর ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দু'টি গুণ সৃষ্টি করে দেন ---এক. প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, দুই. সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তখন তাদের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র ব্যাপক আযাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর পর বলা হয়েছে ঃ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ
مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ
يَصْدِفُوْنَ (٤٦) قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً
هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ (٤٧) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا
مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٤٨) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ (٤٩)

(৪৬) আপনি বলুন ঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে ? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। (৪৭) বলে দিন ঃ দেখ তো, যদি আল্লাহ্র শাস্তি আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালিম সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে ? (৪৮) আমি পয়গম্বরদের প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শকরূপে—

অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয় তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৪৯) যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে আরও) বলুন ঃ বল, যদি আল্লাহ্ তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি সম্পূর্ণ (ছিনিয়ে) নিয়ে যান (অর্থাৎ যদি তোমরা কোন কিছু শুনতে ও দেখতে অক্ষম হয়ে পড়) এবং তোমাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেন (যাতে তোমরা অন্তর দ্বারা কোন কিছু বুঝতে না পার), তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে কি, যে এ (বস্তু)-গুলো তোমাদেরকে প্রত্যর্পণ করবে ? (তোমাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও যখন এরূপ কেউ নেই, তখন কিরূপে অন্যকে উপাসনার যোগ্য মনে কর ?) আপনি দেখুন তো আমি কি (কি)-ভাবে বিভিন্নরূপে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করছি ! এর পরও (এসব নিদর্শনে চিন্তাভাবনা ও তার ফলাফল স্বীকার করা থেকে) তারা বিমুখ হচ্ছে। আপনি (তাদেরকে আরও) বলুন ঃ বল, যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি আকস্মিক কিংবা প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে অত্যাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত (এ শাস্তি দ্বারা) অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি ? (উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তি আগমন করলে তা তোমাদের অত্যাচারের কারণে তোমাদের উপরই নিপতিত হবে। ঈমানদাররা বেঁচে থাকবে)। কাজেই مرگ انبوہ جشنے دارد (পাইকারী মৃত্যুও একটি উৎসব বিশেষ ---এ সান্ত্বনাও ভুলে যাওয়া উচিত যে, আযাব আগমন করলে আমাদের সাথে মুসলমানদের উপরও তা নিপতিত হবে।) এবং আমি পয়গম্বরদের (যাদের পয়গম্বরী অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছি) শুধু এ কারণে প্রেরিত করি যে, তাঁরা (ঈমানদার ও অনুগতদের আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের নিয়ামতের) সুসংবাদ দেবেন এবং (কাফির ও গোনাহ্‌গারদের আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির) ভয় প্রদর্শন করবেন। (এ জন্য প্রেরণ করি না যে, বলা-কওয়া শেষ হওয়ার পরও বিরোধীরা তাদেরকে যেসব আবোল-তাবোল ফরমায়েশ করবে তারা তা পূর্ণ করে দেখাবেন।) অনন্তর (পয়গম্বরদের সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের পর) যে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং (স্বীয় অবস্থার বিশ্বাসগত ও কার্যগত) সংশোধন করে নেবে তাদের (পরকালে) কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। পক্ষান্তরে যারা (সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি-প্রদর্শনের পরেও) আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের (মাঝে মাঝে ইহকাল আর পরকালে তো অবশ্যই) শাস্তি স্পর্শ করবে। কারণ, তারা বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে।

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ

لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى

وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا

إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

(৫০) আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া, আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি একজন সম্মানিত ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে ? তোমরা কি চিন্তা কর না ? (৫১) আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশংকা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্র হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না—যাতে তারা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (হঠকারীদের) বলে দিন ঃ আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার সব ভাণ্ডার রয়েছে (যে, যা চাওয়া হবে, তাই নিজ বলে দিয়ে দেব) এবং আমি সব অদৃশ্য বিষয়েও অবগত নই (যা আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য) এবং তোমাদের বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা, আমি তো শুধু ঐ ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে---(তাতে ওহী অনুযায়ী নিজে করা এবং অপরকে আহ্বান করার কথা রয়েছে। পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরদের অবস্থাও তাই ছিল। অতঃপর) আপনি তাদেরকে বলুন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি (কখনো) সমান হতে পারে ? (এ বিষয়টি যখন সর্বজনস্বীকৃত,) অনন্তর তোমরা কি (চক্ষুষ্মান হতে চাও না এবং উল্লিখিত বক্তব্যে সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে পুরোপুরি) চিন্তা কর না ? বস্তুত (যদি এতেও তারা হঠকারিতা পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে দিন এবং স্বীয় আসল কর্তব্য রিসালত প্রচারে নিয়োজিত হোন) এমন লোকদের (কুফর ও গোনাহ্‌র কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তির বিশেষভাবে) ভয় প্রদর্শন করুন, যারা (বিশ্বাসগতভাবে কিংবা কমপক্ষে সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে) ভয় করে (যে, কিয়ামতে স্বীয় পালনকর্তার দিকে এমতাবস্থায় একত্রিত হতে হবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া যাদের কাফিররা সাহায্যকারী কিংবা সুপারিশকারী মনে করেছিল, তখন তাদের মধ্য থেকে) কোন সাহায্যকারী এবং কোন সুপারিশকারী হবে না---যেন তারা শাস্তিকে ভয় করে (এবং কুফর ও গোনাহ্ থেকে বিরত হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের পক্ষ থেকে ফরমায়েশী মো'জেযার দাবী ঃ মক্কার কাফিরদের সামনে রসূলে করীম (সা)-এর অনেক মো'জেযা এবং আল্লাহ্ তা'আলার খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ

পেয়েছিল। তাঁর ইয়াতীম অবস্থায় দুনিয়াতে আগমন, লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর অবস্থায় থাকা, এমন দেশে জন্মগ্রহণ করা, যার আশেপাশে না কোন বিদ্বান ব্যক্তি ছিল এবং না কোন বিদ্যাপীঠ, জীবনের চল্লিশ বছর পর্যন্ত খাঁটি নিরক্ষর অবস্থায় মক্কাবাসীদের সামনে থাকা, অতঃপর চল্লিশ বছর পর হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বিস্ময়কর দার্শনিক উক্তি বের হতে থাকা ---এগুলো নিঃসন্দেহে একেকটি মো'জেযা ও আল্লাহ্র নিদর্শন ছিল। তাঁর দার্শনিক উক্তির প্রাঞ্জলতা ও অলঙ্কার প্রাঞ্জলভাষী আরব জাতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাদের চিরতরে নির্বাক করে দিয়েছে। তাঁর উক্তির অর্থ প্রজ্ঞাবহ এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত মানবীয় প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। একজন কামেল মানুষের কর্মধারা কি হবে, তিনি তা শুধু চিন্তা ক্ষেত্রেই রচনা করেন নি, বরং কার্যক্ষেত্রে দুনিয়াতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রচলিত করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত কর্ম-ব্যবস্থা মানব-বুদ্ধি ও মানব মস্তিষ্কের পক্ষে রচনা করা সম্ভবপর নয়। যেসব মানুষ মানবতাকে ভুলে গিয়ে গরু-ছাগল ও ঘোড়া-গাধার মত শুধু পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিল, তিনি তাদেরকে বিশুদ্ধ মানবতার শিক্ষা দেন এবং তাদের জীবনের গতি এমন সুউচ্চ লক্ষ্যের দিকে ঘুরিয়ে দেন, যার জন্য তাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের প্রত্যেকটি সময়াবর্তন এবং তাতে সংঘটিত প্রত্যেকটি মহান ঘটনা একেকটি মো'জেযা ও ঐশী নিদর্শন ছিল, যা দেখার পর ন্যায়নিষ্ঠ বুদ্ধিমানের জন্য আর কোন নিদর্শন ও মো'জেযা দাবী করার অবকাশ ছিল না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোরায়েশ কাফিররা নিজেদের বাসনা অনুযায়ী অন্য রকম মো'জেযাসমূহের মধ্যে কোন কোনটি আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী করেছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযাটি শুধু কোরায়েশরাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল।

তাদের দাবী অনুযায়ী এমন বিরাট মো'জেযা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুফর ও পথভ্রষ্টতায় এবং জেদ ও হঠকারিতায় পূর্ববৎ অটল থেকে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার এ নিদর্শনকে إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ বলে উপেক্ষা করে। এসব বিষয় দেখা ও বোঝা সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে নতুন নতুন মো'জেযা দাবী করত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাই বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ তারা বলে, মুহাম্মদ সত্যি সত্যি যদি আল্লাহ্র রসূল হন, তবে তাঁর কোন মো'জেযা প্রকাশ পায় না কেন? এর উত্তরে কোরআন মহানবী (সা)-কে আদেশ দিয়েছে যে, তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুই করতে সক্ষম। তোমাদের চাওয়া ছাড়াই তিনি যেমন অসংখ্য নিদর্শন ও মো'জেযা অবতীর্ণ করেছেন, তেমনি তিনি তোমাদের

প্রার্থিত মো'জেযাও অবতীর্ণ করতে পারেন। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র একটি শাশ্বত রীতি রয়েছে। তা এই যে, কোন জাতিকে তাদের প্রার্থিত মো'জেযা দেখানোর পরও যদি তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের তাৎক্ষণিক আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। তাই প্রার্থিত মো'জেযা প্রকাশ না করার মধ্যেই জাতির মঙ্গল নিহিত। কিন্তু এ সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ অনেক মানুষ প্রার্থিত মো'জেযা দেখানোর জন্যই পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবীর উত্তর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কাফিররা বিভিন্ন সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তিনটি দাবী করেছিল। এক. যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে থাকেন, তবে মো'জেযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আমাদের জন্য একত্র করে দিন। দুই. যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত করুন, যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। তিন. আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতই পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও বাজারে ঘোরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিভাবে আল্লাহ্‌র রসূল হতে পারেন! সৃষ্টি ও গুণাবলীতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোন ফেরেশতা হলে আমরা তাঁকে আল্লাহ্‌র রসূল ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম।

উপরোক্ত তিনটি দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ
اِنِّىْ مَلَكٌ ۝ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে আপনি বলে দিন ঃ তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার দাবী করছ, কিন্তু আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত ? তোমরা দাবী করছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদের বলে দিই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি ? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতা-সুলভ গুণাবলী দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আমি ফেরেশতা ?

মোট কথা, আমি যে বিষয় দাবী করি, তার প্রমাণই আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র রসূল। তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। এর জন্য একটি দুটি নয়---অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে।

রিসালত দাবী করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সব ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়া, আল্লাহ্ তা'আলারই মত প্রত্যেক ছোট বড় অদৃশ্য বিষয় অবগত হওয়া এবং মানবিক গুণের উর্ধ্বে কোন ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরী নয়। রসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহ্ প্রেরিত ঐশী বাণী অনুসরণ করবেন ; নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ করতে আহবান করবেন।

এ নির্দেশনামা দ্বারা একদিকে রিসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং অপরদিকে রসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদেরও পথনির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খৃস্টানদের মত রসূলকে আল্লাহ্ না মনে করে বসে। রসূলের মাহাত্ম্য ও ভালবাসার দাবীও তাই ; এ ব্যাপারে ইহুদী ও খৃস্টানদের মত বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদীরা রসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খৃস্টানরা সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ্ বানিয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরবিদরা অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআন স্বয়ং ধনভাণ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে ঃ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। এতে বোঝা যায় ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বোঝানো হয়েছে, এতে কোন বিশেষ বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তফসীরবিদরা যেসব নির্দিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। কাজেই এতে কোন মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র ভাণ্ডার পয়গম্বর কুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোন ওলী অথবা বুযুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা---তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন. যাকে যা ইচ্ছা দিতে পারেন---সুস্পষ্ট মূর্খতা বৈ কিছু নয়।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ অর্থাৎ আমি তোমাদের বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার মানবিক গুণ দেখে রিসালতে অস্বীকার করবে।

মধ্যবর্তী বাক্যে কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ বলার পরিবর্তে وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে "আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না" বলা হয়েছে।

তফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোন ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফিররাও জানত যে, আল্লাহ্ তা'আলার সব ভাণ্ডার রসূলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশত এসব দাবী করত। কাজেই কাফিরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী কখনও করিনি।

কিন্তু অদৃশ্য বিষয় জানার প্রশ্নটি এমন নয়। কেননা, তারা জ্যোতিষী ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের সম্পর্কেও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। অতএব আল্লাহ্‌র রসূল সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস রাখাও অবান্তর ছিল না। বিশেষ করে, তারা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখ থেকে অনেক অদৃশ্য সংবাদও শুনেছিল এবং তদনুযায়ী ঘটনা ঘটতে দেখেছিল। তাই এখানে শুধু 'বলি না' বলাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং 'অদৃশ্য বিষয় জানি না' বলা হয়েছে। এতে ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান ঘটানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে যেসব অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান কোন রসূল, ফেরেশতা কিংবা ওলীকে দান করা হয়, কোরআনের পরিভাষায় তাকে 'অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান' বলা যায় না।

এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেছে। এ ব্যাপারে কোন মুসলমানের দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। বরং সব ফেরেশতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে যেটুকু জ্ঞান দান করা হয়েছিল তাদের সবার জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশী জ্ঞান একা মহানবী (সা)-কে দান করা হয়েছিল। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস তাই। কিন্তু এর সাথে কোরআন-সুন্নাহ্‌র অসংখ্য বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব পণ্ডিতের এটাও বিশ্বাস যে, সমগ্র সৃষ্টজগতের পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁর স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও সর্বশক্তিমান হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু কোন ফেরেশতা কিংবা রসূল তাঁর সমতুল্য নয়, এ কারণেই কোন ফেরেশতা কিংবা পয়গম্বরকে লাখো অদৃশ্য বিষয় জানা সত্ত্বেও 'আলিমুল গায়ব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী বলা যায় না। এ গুণ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার।

মোটামুটিভাবে সাইয়্যেদুর-রসূল, সরওয়ারে-কায়েনাত, ইমামুল-আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা সম্পর্কে সর্বাধিক অর্থবহ বাক্য হচ্ছে এই ঃ بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر (সংক্ষেপে আল্লাহ্‌র পরে তুমিই সবার বড়)।

জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠার ব্যাপারেও আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত ফেরেশতা ও নবী-রসূলের চাইতে তাঁর জ্ঞান অধিক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সমান নয়। সমান হওয়ার দাবী করা খৃস্টবাদ প্রবর্তিত বাড়াবাড়ির পথ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না। উদ্দেশ্য এই যে, মানসিক আবেগপ্রবণতা ও হঠকারিতা পরিহার করে বাস্তব সত্য উপলব্ধি কর, যাতে

তোমরা অন্ধদের মধ্যে গণ্য না হও এবং চক্ষুষ্মান হয়ে যাও। সামান্য চিন্তা-ভাবনা দ্বারা তোমরা এ দৃষ্টি অর্জন করতে পার।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রিসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কিয়ামতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশংকা করে।

মোট কথা এই যে, কিয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে ঃ এক কিয়ামতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, দুই. অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং তিন. সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। এ তিন প্রকার লোককেই ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ নবী-রসূলদের দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অনেক আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু প্রথমোক্ত দু' প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে বেশী আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ — অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হওয়ার আশংকা করে, তাদেরকে কোরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ
وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ
عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا
فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ
مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾ ع

(৫২) আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (৫৩) আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি—যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন? (৫৪) আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞানতাবশত কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৫৫) আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি—যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদেরকে (স্বীয় মজলিস থেকে) বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল (অর্থাৎ সম্ভাব্য সর্বদা) আপন পালনকর্তার ইবাদত করে যাতে শুধুমাত্র আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি কামনা করে (এবং জাঁকজমক, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। অর্থাৎ তাদের ইবাদত সার্বক্ষণিক এবং নিষ্ঠাপূর্ণ হয়ে থাকে। নিষ্ঠা যদিও একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু লক্ষণাদি দ্বারা তার পরিচয় পাওয়া যায়। যতক্ষণ নিষ্ঠার বিপক্ষে কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নিষ্ঠার ধারণা রাখাই সঙ্গত।) এবং তাদের (অভ্যন্তরীণ) হিসাব (ও অনুসন্ধান) বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং (তাদের অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান আপনার দায়িত্বে না থাকা এমনই নিশ্চিত, যেমন) আপনার (অভ্যন্তরীণ) হিসাব (ও অনুসন্ধান) বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। (অর্থাৎ যদি তাদের অভ্যন্তরীণ আন্তরিকতা অনুসন্ধান করা আপনার দায়িত্বে থাকত, তবে এরূপ অবকাশ ছিল যে, যাদের আন্তরিকতা নিশ্চিত নয় এবং তাদেরকে বহিষ্কার করার অন্য কোন বৈধ কারণও নেই। মহানবী (সা) ছিলেন উম্মতের অভিভাবক---তাই অধীনস্থদের অবস্থা অনুসন্ধান করবেন---এরূপ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এর বিপরীত উম্মত স্বীয় পয়গম্বরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসন্ধান করবে---এরূপ কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই এটি নিশ্চিতরূপে ঋণাত্মক বিষয়। এখানে সম্ভাবনাযুক্ত বিষয়কে নিশ্চিত বিষয়ের সমপর্যায়ে গণ্য করে ঋণাত্মক করা হয়েছে, যাতে এর ঋণাত্মক বিষয় হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়।) নতুবা (তাদেরকে বহিষ্কার করার কারণে) আপনি অসঙ্গত আচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। এবং (আমি মু'মিনদের দরিদ্র ও কাফিরদের ধনাঢ্য করে রেখেছি, যা বাহ্যত অনুমানের বিপরীত। এর কারণ এই যে,) এভাবেই আমি (তাদের মধ্য থেকে) এক (অর্থাৎ কাফিরদের)-কে অন্যদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি (অর্থাৎ এ কর্মপন্থা দ্বারা কাফিরদের পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য) যাতে তারা (মু'মিনদের সম্পর্কে) বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের

সবার মধ্য থেকে (বাছাই করে) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন ? (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের জন্য কি তাদেরকেই বাছাই করেছেন ?) আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত নন ? (এ দরিদ্ররা স্বীয় নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ, সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত, সত্যধর্ম ও স্বীকৃতির দ্বারা সম্মানিত। পক্ষান্তরে ধনাঢ্যরা অকৃতজ্ঞতা ও কুফরে লিপ্ত। ফলে এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত।) এবং যখন তারা আপনার কাছে আসে, যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস রাখে ; তখন আপনি (তাদেরকে সুসংবাদ শোনানোর জন্য) বলে দিন ঃ (তোমাদের উপর সর্বপ্রকার বিপদাপদ পতিত হবে), তোমরা (সেগুলো থেকে নিরাপদে ও শান্তিতে থাক।) আর একথাও যে, তোমাদের পালনকর্তা (স্বীয় কৃপায়) অনুগ্রহ করা (এবং তোমাদের নিয়ামত দান করা) নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত করেছেন। (এমনকি) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে (যা) অজ্ঞতাবশত (হয়ে যায় ; কেননা, আদেশের বিরোধিতা করা কার্যগত অজ্ঞতা। কিন্তু) অনন্তর এর পরে তওবা করে এবং (ভবিষ্যতে নিজ কর্ম) সংশোধন করে (তওবা ভঙ্গ করার পর পুনরায় তওবা করাও এর অন্তর্ভুক্ত) তবে আল্লাহ্ তা'আলা (তার জন্যও) অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (অর্থাৎ গোনাহ্র শাস্তিও ক্ষমা করে দেবেন।) করুণাময় (অর্থাৎ নানা রকম নিয়ামতও দেবেন।) এবং (যেভাবে আমি এ ক্ষেত্রে মু'মিন ও কাফিরদের অবস্থা ও পরিণতি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি) এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি (যাতে মু'মিনদের তরীকাও পরিষ্কার হয়ে যায়) এবং যাতে অপরাধীদের তরীকা (ও) প্রকাশ করে দেওয়া হয় (এবং সত্য ও মিথ্যা ফুটে ওঠার কারণে সত্যান্বেষীর পক্ষে সত্য উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অহংকার ও মূর্খতা দূরীকরণ, মান অপমানের ইসলামী মাপকাঠি ঃ ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই ঃ যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্যত্ব কাকে বলে তা জানে না ; বরং মানুষকে জগতের বিভিন্ন জানোয়ারের মধ্যে এমন একটি সজ্ঞান জানোয়ার মনে করে, যে অন্য জানোয়ারদের অধীনস্থ ও প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের মতে মানবজীবনের লক্ষ্য পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিকে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে ? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন জগতে ভাল-মন্দ, ছোটবড়, সম্মানিত ও অপমানিত, ভদ্র ও ইতর পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, যার কাছে পানাহার ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্মা, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং যার কাছে এসব বস্তু স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অকৃতকর্মা।

সত্য বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্য সচ্চরিত্রের ও সৎকর্মের কোন প্রয়োজনই নেই, বরং যে কর্ম ও চরিত্র এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক, তাই সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র।

এ কারণেই নবী-রসূলদের এবং তাঁদের আনীত ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা ছিল এই যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখ-শান্তি যেমন পূর্ণ ও চিরস্থায়ী, তেমনি কষ্ট এবং শাস্তিও পূর্ণ ও চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন স্বয়ং

লক্ষ্য নয়, বরং পরজীবনে যে যে বিষয় উপকারী তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আসল লক্ষ্য।

رہا مرنے کی تیاری میں مصروف
مرا کام اور اس دنیا میں تھا کیا

মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জন্তু-জানোয়ারকে পরজীবনের চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্ববৃহৎ চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠি অধিক পানাহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণে হবে না, বরং সচ্চরিত্র ও সৎকর্মই হবে আভিজাত্যের একমাত্র মাপকাঠি। পরকালের সম্মান এগুলোর উপরই নির্ভরশীল।

জগদ্বাসী যখনই নবী-রসূলদের নির্দেশাবলী, শিক্ষা এবং পরকাল-বিশ্বাসের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, তখনই তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিও সামনে এসে গেছে অর্থাৎ শুধু অন্ন ও উদরই মান-অপমান, ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে সফলকাম তারা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, তারা দরিদ্র, সম্মানহীন, নীচ ও লাঞ্ছিত বলে পরিগণিত রয়েছে।

তাই সর্বকালে শুধু পার্থিব জীবনের গোলক-ধাঁধায় আবদ্ধ মানুষ বিত্তবানদের সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং দীনদরিদ্র বিত্তহীনদের সম্মানহীন ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ মাপকাঠির ভিত্তিতেই হযরত নূহ (আ)-এর কওম বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদের নীচ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল ঃ আমরা এ নীচদের সাথে একত্রে বসতে পারি না। আপনি যদি আমাদের কোন পয়গাম শোনাতে চান, তবে দরিদ্র ও নিঃস্বদের আগে দরবার থেকে বহিষ্কার করুন। قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ অর্থাৎ এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ যত সব ছোট লোক আপনার অনুসারী? হযরত নূহ (আ) তাদের এ হৃদয়বিদারক উক্তির জওয়াবে পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে বললেন ঃ

وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ -

অর্থাৎ আমি তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নই। কাজেই তারা নীচ কি ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত, তার মীমাংসা করতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের স্বরূপ ও হিসাব আমার পালনকর্তাই জানেন। তিনি অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কেও জ্ঞাত।

হযরত নূহ (আ) এভাবে মূর্খ ও অহংকারী এবং ভদ্রতা ও নীচতার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের চিন্তাধারাকে একটি সুস্পষ্ট বাস্তব সত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি বলে দিলেন ঃ ভদ্র ও নীচ শব্দগুলো তোমরা ব্যবহার কর ঠিকই, কিন্তু এগুলোর স্বরূপ তোমাদের জানা নেই। তোমরা শুধু বিত্তবানকে ভদ্র আর দরিদ্রকে নীচ বলে থাক, অথচ বিত্ত ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি নয়। এর মাপকাঠি হচ্ছে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র। এ স্থলে হযরত নূহ (আ) বলতে

পারতেন যে, সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের মাপকাঠিতে এরা তোমাদের চাইতে অধিক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত। কিন্তু পয়গম্বরসুলভ প্রচারপদ্ধতি তাঁকে এরূপ বলার অনুমতি দেয়নি। এরূপ বললে প্রতিপক্ষ উত্তেজিত হয়ে উঠত। তাই শুধু এতটুকু বলেছেন যে, নীচতা তো ক্রিয়াকর্মের উপর ভিত্তিশীল। আমি তাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নই। তাই তাদের ভদ্র বা নীচ হওয়ার ফয়সালা করতে পারি না।

নূহ (আ)-র পরও সর্বযুগেই দুনিয়ার অহংকারী লোকরা দরিদ্রদের নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত আখ্যায়িত করে এসেছে, যদিও তারা সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের দিক দিয়ে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত ছিল। এরাই স্বীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও উত্তম চরিত্রের কারণে প্রতি যুগে আম্বিয়া (আ)-র আহবানে সর্ব প্রথম সাড়া দিয়েছেন। এমনকি, জগতের ধর্মীয় ইতিহাসের পর্যালোচকদের মতে কোন পয়গম্বরের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ এই যে, তার প্রাথমিক অনুসারী হয়েছে সমাজের দরিদ্র স্তরের লোক। এ কারণেই মহানবী (সা)-র পত্র পেঁয়ে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সত্যতা যাচাই করার জন্য পরিচিতজনদের কাছে তাঁর সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এই ঃ তাঁর অধিকাংশ অনুসারী দরিদ্র জনগণ না সমাজের উচ্চস্তরের লোক? যখন তাঁকে জানান হয় যে, দরিদ্র জনগণই তাঁর অধিকাংশ অনুসারী, তখন তিনি মন্তব্য করেন هم اتباع الرسل পয়গম্বরদের প্রাথমিক অনুসারী এরাই হয়ে থাকে।

মহানবী (সা)-র আমলে আবারো এ প্রশ্নই দেখা দেয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লিখিত হয়েছে।

ইবনে কাসীর ইমাম ইবনে জরীরের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শায়বা, ইবনে-রবিয়া, মুত'এম ইবনে আদী, হারেস ইবনে নওফেল প্রমুখ কতিপয় কোরায়েশ সর্দার মহানবী (সা)-র চাচা আবূ তালিবের নিকট এসে বলল ঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তাঁর চারপাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত-পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান করতে পারি না। আপনি তাঁকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি।

আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রা) মত প্রকাশ করে বললেন ঃ এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধুবর্গই। কোরায়েশ সর্দারদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আয়াত অবতরণের পর হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে 'আমার মত ভ্রান্ত ছিল'---এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন হযরত বিলাল হাবশী (রা), সোহায়েব রূমী (রা), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা), আবূ হোযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রা), উসায়দের মুক্ত ক্রীতদাস সহীহ্ (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা),

মেকদাদ ইবনে আমর (রা), মসউদ ইবনুল কারী (রা), যুশ-শিমালাইন (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে-কিরাম। তাঁদের সম্মান ও ভদ্রতার সনদ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই কোরআনের অন্যত্র এর প্রতি জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا
تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝

এতে রসূলে করীম (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "আপনি নিজেকে তাদের মধ্যে নিবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-বিকাল অর্থাৎ সর্বদা আন্তরিকতার সাথে স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে। আপনি স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর কামনায় তাদেরকে বাদ দিয়ে কারও প্রতি নিবদ্ধ করবেন না এবং এমন লোকের আনুগত্য করবেন না, যাদের অন্তরকে আমি আমার যিক্‌র থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যারা স্বীয় রিপুর কামনা-বাসনার অনুসারী এবং সীমালংঘন করাই যাদের কাজ।"

আলোচ্য আয়াতে দরিদ্রদের প্রশংসায় বলা হয়েছে তারা সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌কে ডাকে। এতে প্রচলিত বাক-পদ্ধতি অনুযায়ী 'সকাল-বিকাল' বলে দিবারাত্রির সব সময়কে বোঝানো হয়েছে এবং ডাকা বলে ইবাদত করা বোঝানো হয়েছে। দিবারাত্রির ইবাদতের সাথে يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আন্তরিকতাবিহীন ইবাদতের কোনই মূল্য নেই।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে তাদের হিসাব আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাবও তাদের দায়িত্বে নয়। ইবনে আতিয়্যা, যামাখশারী (র) প্রমুখের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এতে حِسَابِهِمْ ও عَلَيْهِمْ -এর সর্বনাম দ্বারা মুশরিক সর্দারদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবী করত। আয়াতে মহানবী (সা)-কে বলা হয়েছে, এরা বিশ্বাস স্থাপন করুক বা না করুক আপনি দরিদ্র মুসলমানদের তুলনায় এদের পরওয়া করবেন না। কেননা এদের হিসাবের দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করা হয়নি, যেমন আপনার হিসাবের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়নি। যদি এ দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করা হতো অর্থাৎ তাদের মুসলমান না হওয়ার কারণে আপনাকে জবাবদিহি করতে হতো, তবে না হয় আপনি তাদের খাতিরে দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন। যখন এরূপ নয় তখন তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রকাশ্য অবিচার। এমন করলে আপনি অবিচারকারীদের মধ্যে গণ্য হবেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি এমনিভাবে একজনকে অন্যজনের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলে রেখেছি, যাতে কাফিররা আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও ক্ষমতার এ তামাশা দেখে যে, যে দরিদ্র মুসলমানদেরকে তারা ঘৃণার চোখে দেখত, রসূলের অনুসরণ করে তারা কোন্ স্তরে পৌঁছে গেছে এবং ইহকালে ও পরকালে তারা কিরূপ সম্মানের অধিকারী হয়েছে এবং যাতে তারা এ বিষয়েও আলোচনা করে যে, আমাদের অভিজাত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে এ গরীবরাই কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিয়ামতের যোগ্য ছিল ? .

ھــر دمش بــرمنِ دل سوختۂ لطفِ دگراست
ایں گدا بیں کہ چہ شائستۂ انعام افتاد

কাশ্‌শাফ প্রণেতা আল্লামা যামাখশারী (র) প্রমুখের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কাফিরদের এ উক্তি দরিদ্র মুসলমানদের মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষারই ফল। তারা এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে ! কারণ, আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্যের বিকাশ দেখে তাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত ছিল যে, ভদ্রতা ও নীচতা অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু তারা তা না করে উলটো আল্লাহ্ তা'আলাকে দোষারোপ করতে থাকে যে, সম্মানের যোগ্য ছিলাম আমরা, অথচ আমাদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে কেন সম্মানিত করা হল ? এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় আসল তাৎপর্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল নন ? উদ্দেশ্য এই যে, যারা অনুগ্রহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ তারাই প্রকৃতপক্ষে ভদ্র ও সম্মানিত এবং তারাই নিয়ামত ও সম্মানের যোগ্য। পক্ষান্তরে তারা সম্মানের যোগ্য নয়, যারা দিবারাত্র নিয়ামতদাতার নিয়ামতে গড়াগড়ি সত্ত্বেও তাঁর অবাধ্য।

কতিপয় নির্দেশ ঃ উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা যায় ঃ প্রথমত কারও ছিন্নবস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারও নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন যারা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধূলি-ধূসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রিয়। তাঁরা যদি কোন কাজের আবদার করে বসেন যে, এটা 'এরূপ হবে' তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।

দ্বিতীয়ত শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার অবমাননা। এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম।

তৃতীয়ত কোন জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যও জরুরী অর্থাৎ পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সবার কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। কিন্তু যারা তার শিক্ষার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যের কারণে তাদেরকে পেছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জায়েয নয়।

উদাহরণত অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্যের জন্য অজ্ঞ মুসলমানদের শিক্ষাদান ও সংশোধনকে পেছনে ফেলে দেওয়া উচিত নয়।

চতুর্থত, আল্লাহ্‌র নিয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে অপরিহার্য।

وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ......—আয়াত সম্পর্কে তফসীরবিদদের উক্তি দ্বিবিধ। অধিকাংশের মতে এ আয়াতগুলোও পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সমর্থনে তাঁরা এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যে, কোরায়েশ সর্দাররা আবূ তালিবের মাধ্যমে দাবী জানাল যে, আপনার মজলিসে দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোক থাকে। তাদের কাতারে বসে আপনার কাথাবার্তা শুনতে পারি না। আমাদের আগমনের সময় যদি তাদের মজলিস থেকে সরিয়ে দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার কথাবার্তা শুনব ও চিন্তা-ভাবনা করব।

এতে হযরত ফারুকে-আযম (রা) পরামর্শ দিলেন যে, এ দাবী মেনে নিতে অসুবিধা কি? মুসলমানরা তো অকৃত্রিম বন্ধু আছেই। তাদেরকে কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকতে বলে দেওয়া হবে। সম্ভবত এভাবে কোরায়েশ সর্দাররা আল্লাহ্‌র কালাম শুনবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে।

কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে এ পরামর্শের বিপক্ষে নির্দেশ আসে যে, কখনও এমনটি করা যাবে না। এমন করা অন্যায় ও অবিচার। এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলে ফারূকে আযম (রা) নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি ভীত হয়ে পড়েন যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়ে হয়ত তিনি মহা অন্যায় করে ফেলেছেন। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতের সারমর্ম এই যে, আপনাকে অতীত ভুলের জন্য পাকড়াও করা হবে না বলে তাদেরকে শান্ত করে দিন। শুধু তাই নয়, পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অসংখ্য নিয়ামতের ওয়াদাও শুনিয়ে দিন। তার দরবারের এ আইন সম্পর্কেও বলে দিন যে, যখন কোন মুসলমান অজ্ঞতাবশত কোন মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে নেয় এবং ভবিষ্যতে সংশোধন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীত গোনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং ভবিষ্যতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিয়ামত থেকেও তাকে বঞ্চিত করবেন না।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতগুলো পূর্ববতী আয়াতসমূহে বর্ণিত বিশেষ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এসব আয়াতের বিষয়বস্তুকে একটি স্বতন্ত্র নির্দেশনামা হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়বস্তু তাদের সম্পর্কে, যারা অজ্ঞতাবশত কোন গোনাহ্ করে ফেলে এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়।

চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, উপরোক্ত উভয়বিধ উক্তিতে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা

নেই। কেননা, সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন মজীদের কোন নির্দেশ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও যদি তার ভাষা ও বিষয়বস্তু ব্যাপক হয়, তবে সে নির্দেশটি শুধু সে বিশেষ ঘটনার সাথেই সম্পৃক্ত থাকে না বরং এটি ব্যাপক নির্দেশের রূপ পরিগ্রহ করে। তাই যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে তবুও এ নির্দেশ একটি ব্যাপক বিধির মর্যাদা রাখে, যা প্রত্যেক গোনাহগারের বেলায় প্রযোজ্য, যে গোনাহ্ করার পর স্বীয় ভুল বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত কর্ম সংশোধন করে নেয়।

এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ -

অর্থাৎ আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে (এখানে ايات -এর অর্থ কোরআনের আয়াত হতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও কুদরতের সাধারণ নিদর্শনাবলীও হতে পারে।) তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে سلام عليكم বলে সম্বোধন করুন। এখানে سلام عليكم এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে ঃ এক. তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সালাম পৌঁছিয়ে দিন, যাতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান বোঝা যায়। এতে করে ঐ সব দরিদ্র মুসলমানের মনোবেদনার চমৎকার প্রতিকার হয়ে গেছে, যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কোরায়েশ সর্দাররা করেছিল। দুই. আপনি তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের ভুলত্রুটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তারা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ — বাক্যে এ অনুগ্রহের উপর আরও অনুগ্রহ ও নিয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলমানদের বলে দিন ঃ তোমাদের পালনকর্তা দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ বাক্যে প্রথমত رب (পালনকর্তা) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পালনকর্তা। এখন জানা কথা যে, কোন পালনকর্তা স্বীয় পালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর رب শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের পালনকর্তা দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোন ভাল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল

আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? বিশেষ করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়।

সহীহ্ বোখারী, মুসলিম ও মসনদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে রেখে দিলেন। তাতে লেখা রয়েছে ঃ ان رحمتى غلبت على غضبى অর্থাৎ আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে।

হযরত সালমান (রা) বলেন ঃ আমি তওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তখন 'রহমত' (দয়া) গুণটিকে একশ' ভাগ করে এক ভাগ সমগ্র সৃষ্ট জীবকে দান করলেন। মানুষ, জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দয়ার যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তা ঐ এক ভাগেরই ক্রিয়া। পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা ঐ এক ভাগ দয়ারই ফলশ্রুতি। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য রেখেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে একে নবী করীম (সা)-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই অনুমান করা যায় যে, সৃষ্ট জীবের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু।

এটা জানা কথা যে, কোন মানুষ এমনকি ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্যের উপযুক্ত ইবাদত ও আরাধনা করতে পারে না এবং মাহাত্ম্য বিরোধী আনুগত্য জগদ্বাসীর দৃষ্টিতেও পুরস্কারের কারণ হওয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টির কারণ বলে গণ্য হয়। এ হচ্ছে আমাদের ইবাদত, আরাধনা ও পুণ্যকর্মের অবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্বের সাথে তুলনা করে দেখলে এগুলো গোনাহ্র চাইতে কম নয়। তদুপরি সত্যিকার গোনাহ্ ও পাপ থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয় (الا من عصمه الله তবে আল্লাহ্ যাকে মুক্ত রাখেন)। এমতাবস্থায় একটি লোকের পক্ষেও আযাব থেকে রেহাই পাওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক মানুষের উপর সদা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত নিয়ামত বর্ষিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এসব হচ্ছে ঐ দয়ারই ফলশ্রুতি, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন।

তওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায় ঃ এরপর একটি বিধির আকারে দয়ার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ

أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَصْلَحَ

فَأَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত কোন মন্দ কাজ করে বসে, এরপর তওবা করে এবং

স্বীয় কাজ সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; তার গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নিয়ামতও দান করবেন।

আয়াতের ' অজ্ঞতা' শব্দ দ্বারা বাহ্যত কেউ ধারণা করতে পারে যে, গোনাহ্ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্ঞতাবশত কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, জেনেশুনে গোনাহ্ করলে হয়তো এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা, এ স্থলে 'অজ্ঞতা' বলে অজ্ঞতার কাজ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন কাজ করে বসে, যার পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল তা করা সম্ভব। এর জন্য বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরী নয়। স্বয়ং جهالت (অজ্ঞতা) শব্দেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে جهل শব্দের পরিবর্তে جهالت-এর ব্যবহার সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই করা হয়েছে। কেননা, جهل শব্দটি علم (জ্ঞান)-এর বিপরীত এবং جهالت শব্দটি حلم و وقار (সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য)-এর বিপরীত। অর্থাৎ جهالت শব্দটি বাকপদ্ধতিতে কার্যগত অজ্ঞতার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। তাই কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অজ্ঞ। এখানে কার্যগত অজ্ঞতাই বোঝানো হয়েছে। এর জন্য অজ্ঞান হওয়া জরুরী নয়। কেননা, কোরআন পাক ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায় ---অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতাবশত হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দুর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়নাবশতই হোক।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এই আয়াতে দু'টি শর্তাধীনে গোনাহ্গারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে। এক. তওবা অর্থাৎ গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ انما التوبة الندم ---অর্থাৎ অনুশোচনার নামই হল তওবা।

দুই. ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং কৃত গোনাহ্র কারণে কারও অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা আল্লাহ্র অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহ্র অধিকার যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি ফরয কর্মে ত্রুটি করা! আর বান্দার অধিকার---যেমন কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কাউকে গালি-গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

তাই তওবার পূর্ণতার জন্য যেমন অতীত গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্য কর্ম সংশোধন করা এবং গোনাহ্র নিকটবর্তী না হওয়া জরুরী, তেমনিভাবে যেসব নামায ও রোযা অমনোযোগিতাবশত তরক করা হয়েছে, সেগুলোর

কাযা করা, যে যাকাত দেওয়া হয়নি, তা এখন দিয়ে দেওয়া, হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে থাকলে এখন তা আদায় করে নেওয়া, নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ্জ করানো প্রভৃতি বিষয়ও অপরিহার্য। যদি জীবদ্দশায় বদলী হজ্জ ও অন্যান্য কার্যের পুরোপুরি সুযোগ না মেলে তবে ওসীয়ত করে যাওয়া যাতে ওয়ারিস ব্যক্তিরা তার ফরযসমূহের ফিদিয়া (বিনিময়) ও বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করে। মোট কথা, কর্ম সংশোধনের জন্য শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম সংশোধন করাই যথেষ্ট নয়; বিগত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করাও জরুরী।

এমনিভাবে যদি কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, তবে তা ফেরত দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি ক্ষমা নেওয়া সম্ভবপর না হয়—উদাহরণত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায় কিংবা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্য নিয়মিতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। এতে আশা করা যায়, সে সন্তুষ্ট হবে এবং ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি পাবে।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؕ قُلْ لَا أَتَّبِعُ
أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦) قُلْ إِنِّي
عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ؕ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ؕ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٧) قُلْ لَوْ أَنَّ
عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (٥٨)

(৫৬) আপনি বলে দিন ঃ আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের ইবাদত কর। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের খুশীমত চলব না। কেননা, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না। (৫৭) আপনি বলে দিন ঃ আমার কাছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বিষয়টি ত্বরিত সংঘটনের দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারও নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৫৮) আপনি বলে দিন ঃ যদি আমার কাছে তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র সংঘটিত হওয়ার জন্য দাবী করছ, তবে আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চুকে যেত। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (হঠকারীদেরকে) বলে দিন ঃ আমাকে (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে) সেসবের (অর্থাৎ বাতিল উপাস্যদের) ইবাদত করতে বারণ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতকে) ছেড়ে যাদের ইবাদত কর। (তাদের পথভ্রষ্টতা প্রকাশ করার জন্য) আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের (মিথ্যা) ধারণাসমূহের অনুসরণ করব না। কেননা, যদি (নাউযুবিল্লাহ্) আমি এমন করি, তখন পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না। আপনি (তাদেরকে আরও) বলে দিন আমার কাছে তো (ইসলাম ধর্ম সত্য হওয়ার) একটি (প্রকৃষ্ট) প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে যা আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আমি প্রাপ্ত হয়েছি ; অর্থাৎ কোরআন মজীদ---এটি আমার মো'জেযা এবং এ দ্বারা আমার সত্যতা প্রমাণিত হয়)। অথচ তোমরা (বিনা কারণে) এর প্রতি মিথ্যারোপ কর। (অর্থাৎ তোমরা যে বলে থাক---ইসলাম ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে আমাদের তা অস্বীকার করার কারণে আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হোক কিংবা অন্য কোন কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হোক। অন্য আয়াতে তাদের এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ---(এর উত্তর এই যে,) তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবী করছ (অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) তা আমার কাছে (অর্থাৎ আমার সামর্থ্যের মধ্যে) নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারও নির্দেশ চলে না (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি অবতরণের নির্দেশ হয়নি, অতএব আমি কিরূপে শাস্তি দেখাব ?) আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে (প্রমাণসহ) বর্ণনা করে দেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। সেমতে তিনি আমার রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণ (হিসাবে) কোরআন মজীদ প্রেরণ করেছেন (এবং অন্যান্য প্রকাশ্য মো'জেযা দেখিয়েছেন। বিশুদ্ধ প্রমাণরূপে এটাই যথেষ্ট। অতএব, তোমাদের ফরমায়েশী মো'জেযা প্রকাশ করার কোনই প্রয়োজন নেই। তাই আপাতত শাস্তি অবতরণ করে মীমাংসা করেন নি) আপনি বলে দিন ঃ যদি আমার কাছে (অর্থাৎ আমার সামর্থ্যের মধ্যে) তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবী করছ (অর্থাৎ শাস্তি), তবে (এখন পর্যন্ত) আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ (যে কোন দিনই) মীমাংসা হয়ে যেত। বস্তুত আল্লাহ্ অত্যাচারীদের সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবহিত রয়েছেন (যে, কার সাথে কখন কি ব্যবহার করা হবে)।

যোগসূত্র ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফিরদের পক্ষ থেকে শীঘ্র আযাব অবতারণের দাবী ও তার উত্তর خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ (শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী) বাক্যে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ শক্তি-সামর্থ্য أَعْلَمُ بِالظَّالِمِيْنَ (অত্যাচারীদের

সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।) বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ
الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٥٩ وَهُوَ الَّذِىْ
يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ
لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ۝٦٠ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ۝٦١
ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ
الْحٰسِبِيْنَ ۝٦٢

(৫৯) আর তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (৬০) তিনিই রাত্রিবেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুত্থিত করেন—যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। (৬১) তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন কি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয় এবং এতে তারা কোন ত্রুটি করে না। (৬২) অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্র কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে (অর্থাৎ তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভাব্য) অদৃশ্য বিষয়ের

ভাণ্ডার রয়েছে (তন্মধ্যে যে বিষয়কে যখন, যে পরিমাণ ইচ্ছা, প্রকাশ করেন। আযাবের বিভিন্ন প্রকারও এর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, এসব বিষয়ের উপর অন্য কারও সামর্থ্য নেই। এসব বিষয়ের পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য যেমন বিশেষভাবে তাঁরই তেমনিভাবে এগুলোর পরিপূর্ণ জ্ঞানও অন্য কারও নেই। সেমতে) এসব গোপন ভাণ্ডারকে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না এবং স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তিনি সবই পরিজ্ঞাত রয়েছেন। কোন পত্র (পর্যন্ত বৃক্ষ থেকে) পতিত হয় না, কিন্তু তিনি তাও জানেন এবং কোন শস্যকণা (পর্যন্ত) মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য (ফল ইত্যাদির মত) পতিত হয় না, কিন্তু এ সবই প্রকাশ্য গ্রন্থে (অর্থাৎ লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ) রয়েছে। আর তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রিবেলায় (নিদ্রার সময়) তোমাদের (অনুভূতি ও চেতনা সম্পর্কিত) আত্মাকে ক্ষণিকের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেন এবং যা কিছু তোমরা দিবসে কর তা (সর্বদা) জানেন অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুত্থিত করেন. যাতে (নিদ্রা ও জাগরণের এ চক্র দ্বারা পার্থিব জীবনের) নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়। অনন্তর তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহ্রই) দিকে (মৃত্যুর পর) তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা (দুনিয়াতে) করছিলে (এবং তদনুযায়ী পুরস্কার, প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান করবেন)। আর (তিনিই স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা) স্বীয় দাসদের উপর প্রতাপান্বিত এবং (হে বান্দা, তোমাদের উপর (তোমাদের কৃতকর্ম ও প্রাণের) রক্ষণাবেক্ষণকারী (ফেরেশতা) প্রেরণ করেন (যারা সারা জীবন তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন এবং তোমাদের প্রাণেরও হেফাযত করেন)। এমনকি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন (সে সময়) আমার প্রেরিতরা (অর্থাৎ প্রেরিত ফেরেশতারা) তার আত্মা হস্তগত করে নেয় এবং এতে সামান্যও ত্রুটি করে না (বরং যখন হেফাযতের নির্দেশ ছিল, তখন হেফাযতই করেছিল এবং যখন মৃত্যুর নির্দেশ আসে, তখন হেফাযতকারী ফেরেশতারা আত্মা করায়ত্তকারী ফেরেশতাদের সাথে একত্র হয়ে যায়।) অতঃপর সবাই স্বীয় সত্যিকার প্রভুর দিকে প্রত্যর্পিত হবে। শুনে রাখ (সে সময়) ফয়সালা আল্লাহ্ তা'আলারই (কার্যকরী) হবে (এবং কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না) এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র ঃ সারা বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে একত্ববাদের বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, শুধু আল্লাহ্র সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানার নামই একত্ববাদ নয়, বরং পূর্ণত্বের যত গুণ আছে, সবগুলোতেই তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা এবং তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করাকে একত্ববাদ বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী হচ্ছে জীবন, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, সৃষ্টি, অন্নদান ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোন সৃষ্ট জীব কোন গুণে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এসব গুণের মধ্যেও দু'টি গুণ সব চাইতে বিখ্যাত। এক. জ্ঞান ; এবং দুই. শক্তি-সামর্থ্য। তাঁর জ্ঞান বিদ্যমান-অবিদ্যমান, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড়, অণু-পরমাণু সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত এবং তার শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতে পরিবেষ্টিত।

উল্লিখিত দু'আয়াতে এ দু'টি গুণই বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি গুণ এমন যে, যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গোনাহ্ ও অপরাধ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বলা বাহুল্য কথায়, কাজে, ওঠা-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি কারও চিন্তায় একথা উপস্থিত থাকে যে, একজন সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং মনের ইচ্ছা ও কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিত জ্ঞান কখনও তাঁকে সর্ব শক্তিমানের অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দেবে না। তাই আলোচ্য আয়াত দু'টি মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার ক্রিয়াকর্ম ও চরিত্র সংশোধন করা ও সংশোধিত রাখার একটি অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ

مَفَاتِحُ শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন مَفْتَحٌ ও مِفْتَحٌ—উভয়টিই হতে পারে। مَفْتَحٌ -এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مِفْتَحٌ-এর অর্থ চাবি; আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ রয়েছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ ও অনুবাদক مَفْتَحٌ-এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা, 'চাবির মালিক' বলেও 'ভাণ্ডারের মালিক' বোঝানো যায়।

কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র ঃ غَيْب শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেন নি।---(মাযহারী) প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐসব অবস্থা ও ঘটনা, যা কিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণত কে কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিযিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন কোথায় কি পরিমাণ হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐ ভ্রূণ, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারও জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী, না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনের আরও যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে।

عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ—এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহ্রই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা,

অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে—তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কোরআনপাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

মোট কথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার নজীরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী ه عند শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য বলা হয়েছে ঃ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ—অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ অবহিত নয়।

তাই এ বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে ঃ এক. আল্লাহ্ তা'আলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি- সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া ; এবং দুই. তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া।

কোরআনের পরিভাষায় غيب শব্দের অর্থ পূর্বে তফসীরে-মাযহারীর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোন সৃষ্ট জীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নে জনসাধারণের মনে বাহ্য দৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু غيب শব্দটি মানুষ সাধারণত আভিধানিক অর্থেই বুঝে। ফলে যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ غيب বলে অভিহিত করে, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উদাহরণত জ্যোতিবিদ্যা, ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, গণনাবিদ্যা কিংবা হস্তরেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা 'কাশ্ফ ও ইলহাম' (সত্য স্বর্গীয় প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞান) দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয়—এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'ইলমে-গায়ব' তথা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত

সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোরআন পাক 'ইলমে-গায়ব'কে আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'কাশ্ফ ও ইলহামে'র মাধ্যমে যদি কোন বান্দাকে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কোরআনের পরিভাষায় তাকে 'ইলমে-গায়ব' বলা যায় না। এমনিভাবে উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও কোরআনী পরিভাষা অনুযায়ী 'ইলমে-গায়ব' নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া। কারণ, আবহাওয়া বিভাগ কিংবা কোন হাকীম-ডাক্তার এসব খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়; কিন্তু স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণের নিকট সেগুলো অজানা থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া বিভাগ, একমাস দু'মাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা, এখনও পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনিভাবে কোন হাকীম-ডাক্তার আজ নাড়ি দেখে বছর -দু'বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত ঔষধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ, স্বভাবত এর কোন ক্রিয়া নাড়িতে থাকে না।

মোট কথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেওয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে ওঠার পরই সবার চোখে ফুটে ওঠে।

এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। ইল্‌ম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা ইল্‌ম বটে, কিন্তু 'গায়ব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলা বাহুল্য, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই, যেমন আমরা কোন রেলগাড়ীর কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌঁছার খবর দিয়ে দিই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবী করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একশ'টি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়।

গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র না কন্যা—এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চারটি ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এক্স-রে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্স-রে যন্ত্রপাতিও ব্যর্থ।

মোট কথা, কোরআনের পরিভাষায় যাকে 'গায়ব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবত যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃতপক্ষে 'গায়ব' নয়, যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন তাকে 'গায়ব' বলেই অভিহিত করা হয়।

এমনিভাবে কোন রসূল ও নবীকে ওহীর মাধ্যমে এবং ওলীকে কাশ্‌ফ ও ইলহামের মাধ্যমে যে কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয়ের ইল্‌ম দেওয়া হয়, দেওয়ার পর তা আর গায়ব থাকে না। কোরআনে একে গায়ব না বলে أَنْبَاءِ الْغَيْبِ (গায়েবের খবর) বলা হয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত রয়েছে ঃ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ —তাই আলোচ্য আয়াত لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ অর্থাৎ অদৃশ্যের ভাণ্ডার আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না—এতে কোনরূপ প্রশ্ন ও ব্যতিক্রমের অবকাশ নেই।

এ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার 'আলিমুল-গায়ব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ গুণটি বিধৃত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যসমূহে এর বিপরীত দৃশ্য অর্থাৎ উপস্থিত ও বিদ্যমান বিষয়সমূহ জ্ঞাত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী ; কোন অণু-পরামাণুও এ জ্ঞানের বাইরে নয়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। কোন বৃক্ষের কোন পাতা ঝরে না, সেটা তিনিই জানেন। এমনিভাবে যে শস্যকণা মাটির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকে, তাও তিনি জানেন এবং সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি আর্দ্র ও শুষ্ক কণা তাঁর জ্ঞানে ও লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মোট কথা, জ্ঞান সম্পর্কিত দু'টি বিষয় একান্তই আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। কোন ফেরেশতা, কোন রসূল কিংবা কোন সৃষ্ট জীব এতে তাঁর অংশীদার নয়। একটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ও অপরটি সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান। কোন অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের অগোচরে নয়। প্রথম আয়াতে এ দু'টি বিশেষ গুণই বর্ণিত হয়েছে। এর প্রথম বাক্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহে সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান বর্ণনা করে প্রথমে বলা হয়েছে ঃ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ —অর্থাৎ স্থলে ও জলে যা রয়েছে তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। 'স্থলে ও জলে' বলে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও দৃশ্য জগৎ বোঝানো হয়েছে ; যেমন সকাল ও বিকাল বলে সম্পূর্ণ সময় এবং পূর্ব ও পশ্চিম বলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ বোঝানো হয়। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত।

অতঃপর বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানগত-ভাবে সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিবেষ্টন করা শুধু এ-ই নয় যে, বড় বড় বস্তুগুলোর খবরই তিনি জানেন ; বরং প্রত্যেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং গোপন থেকে গোপনতম বস্তুও তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا—অর্থাৎ সারা জাহানে কোন বৃক্ষের এমন কোন পাতা ঝরে না, যা তাঁর জানা নেই। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক পাতা ঝরার পূর্বে, ঝরার সময় এবং ঝরার পর তিনি জানেন। তাঁর জানা আছে যে, বৃক্ষের প্রত্যেকটি পাতা কতবার নড়া-চড়া করবে, কখন এবং কোথায় ঝরবে। অতঃপর কোন্ কোন্ অবস্থা অতিক্রম করবে। ঝরার কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তার আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা। কেননা, বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া হচ্ছে পাতার ক্রমবিকাশ ও বনজ জীবনের সর্বশেষ স্তর। তাই শেষ অবস্থা উল্লেখ করে আগা-গোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ—অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের গভীরতায় ও অন্ধকারে যে শস্যকণা পড়ে রয়েছে, তাও তাঁর জানা আছে। প্রথমে বৃক্ষপত্র উল্লেখ করা হয়েছে, যা সাধারণ দৃষ্টির সামনে ঝরে, এরপর শস্যকণা উল্লেখ করা হয়েছে, যা কৃষক ক্ষেতে বপন করে কিংবা আপনা-আপনি মাটির গভীরতায় ও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে, অতঃপর আল্লাহ্র জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পরিব্যাপ্ত হওয়া আর্দ্র ও শুষ্ক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এসব বিষয় আল্লাহ্র কাছে প্রকাশ্য গ্রন্থে লিখিত আছে। কারও কারও মতে 'প্রকাশ্য গ্রন্থ' বলে 'লওহে-মাহ্ফুয' বোঝানো হয়েছে এবং কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্র জ্ঞান। একে 'প্রকাশ্য গ্রন্থ' বলার কারণ এই যে, লিখিত বিষয়বস্তু যেমন ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানও সমগ্র সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে শুধু আনুমানিক নয়---সুনিশ্চিত।

সৃষ্ট জগতের কোন কণাও তাঁর অবগতির বাইরে নয় —এ ধরনের সর্বব্যাপী জ্ঞান যে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য কোরআন পাকের অনেক আয়াত সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। সূরা লোকমানে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ

اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝

অর্থাৎ সরিষা পরিমাণ কোন শস্যকণা যদি পাথরের বুকে বিজড়িত থাকে অথবা আকাশে কিংবা ভূপৃষ্ঠে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও একত্র করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। আয়াতুল-কুরসীতে আছে ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاءَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষের সামনের ও পশ্চাতের সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। সব মানুষ একত্র হয়ে তাঁর জ্ঞানের মধ্য থেকে একটি বিষয়কেও বেষ্টন করতে পারে না। তবে যতটুকু জ্ঞান আল্লাহ্ কাউকে দিতে চান।" সূরা ইউনুসে আছে ঃ

لَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

অর্থাৎ আসমান ও যমীনে এক কণা পরিমাণ বস্তুও আপনার পালনকর্তার জ্ঞান থেকে পৃথক নয়। সূরা তালাকে আছে ঃ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সর্ববিষয়কে বেষ্টন করে রয়েছে।

এমনিভাবে অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান (যাকে কোরআনে অদৃশ্য বিষয় বলা হয়েছে এবং যার ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) কিংবা সমগ্র সৃষ্ট জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। কোন ফেরেশতা কিংবা রসূলের জ্ঞানকে এরূপ সর্বব্যাপী মনে করা খৃস্টানদের মত রসূলকে আল্লাহ্র স্তরে উন্নীত করা ও আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করার শামিল, যা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী শিরক। সূরা শু'আরায় শিরকের স্বরূপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা বলবেঃ আল্লাহ্র কসম, আমরা ঘোর পথ-ভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে (অর্থাৎ মূর্তিদেরকে) বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য করে নিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রসূলদের এবং বিশেষভাবে শেষ নবী (সা)-কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং সব ফেরেশতা ও পয়-গম্বরের চাইতে বেশী দান করেছিলেন। কিন্তু এটা জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলার সমান কারও জ্ঞান নয় এবং হতেও পারে না। নতুবা খৃস্টানদের মত রসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি হবে। তারা রসূলকে আল্লাহ্র সমতুল্য করে দিয়েছে, যার নাম শিরক—(নাউযুবিল্লাহ্)।

এ পর্যন্ত প্রথম আয়াত বর্ণিত হল। এতে আল্লাহ্ তা‘আলার জ্ঞান সম্পর্কিত গুণের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা প্রত্যেক অদৃশ্য, দৃশ্য ও প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কিত গুণ ও তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এ গুণটিও তাঁর সত্তার বৈশিষ্ট্য। বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ
يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতি রাতে তোমাদের আত্মা এক প্রকার করায়ত্ত করে নেন এবং পুনরায় প্রত্যুষে জাগ্রত করে দেন, যাতে তোমাদের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করে দেওয়া হয়। সারাদিন তোমরা যা কিছু কর, তা সবই তিনি জানেন। আল্লাহ্ তা‘আলার অপার কুদরতের ফলেই মানুষের জন্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের একটা নমুনা প্রত্যহ সামনে আসতে থাকে। হাদীসে নিদ্রাকে ‘মৃত্যুর ভাই’ বলা হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, নিদ্রা মানুষের সব শক্তিকে মৃত্যুর মতই নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা নিদ্রা, অতঃপর জাগরণের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে মানুষকে হুঁশিয়ার করেছেন যে, যেভাবে প্রতি রাতে ও প্রতি সকালে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত মৃত্যুবরণ করে জীবিত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত অবলোকন করে, এমনিভাবে ঘটবে সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যু। অতঃপর সামগ্রিক জীবন লাভকেও বুঝে নাও, যাকে হাশর বলা হবে। যে সত্তা প্রথমোক্তটি করতে পারেন, শেষোক্তটি করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ অর্থাৎ অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কৃতকর্ম বলে দেবেন অর্থাৎ কৃতকর্মের হিসাব হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান করা হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তুরই আরও বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা সকল বান্দার উপর প্রবল প্রতাপান্বিত। তিনি বান্দাকে যতদিন জীবিত রাখতে চান, ততদিন তার জন্য দেহরক্ষী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, ফলে তার ক্ষতি করার সাধ্য কারও থাকে না। অতঃপর যখন জীবনের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন এ দেহরক্ষী ফেরেশতাদলই তার মৃত্যুর উসিলা হয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর উপকরণ সংগ্রহে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না, বরং رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত করা হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতির সামনে উপস্থিত এবং সারা জীবনের হিসাবের কথা কল্পনা করলে কার সাধ্য আছে যে, সফলকাম হবে

এবং শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতিই শুধু নন, বান্দাদের মাওলা এবং প্রভুও। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে বান্দাকে সাহায্য করবেন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ নিশ্চয় ফয়সালা এবং নির্দেশ তাঁরই। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, একটিমাত্র সত্তা অগণিত মানুষের হিসাব সমাধা করবেন কিভাবে? তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ অর্থাৎ নিজের কাজের সাথে তুলনা করে আল্লাহ্র কাজকে বোঝা মূর্খতা বৈ নয়। তিনি অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّ
خُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝٦٣ قُلِ اللّٰهُ
يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝٦٤

(৬৩) আপনি বলুন ঃ কে তোমাদের স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহবান কর যে, যদি আপনি আমাদের এ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৬৪) আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ তোমাদের তা থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ-বিপদ থেকে। তথাপি তোমরা শিরক কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) **বলুন ঃ** কে তোমাদেরকে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার (অর্থাৎ দুঃখ বিপদ) **থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে** (মুক্তির জন্য, কখনও) বিনীতভাবে এবং **(কখনও) গোপনে আহবান কর** (এবং বল) যে, (হে আল্লাহ্) যদি তুমি আমাদেরকে এ (অন্ধকার) থেকে (এখনকার মত) মুক্তি দিয়ে দাও, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (অর্থাৎ বড় কৃতজ্ঞতা হচ্ছে একত্ববাদ মেনে চলা---আমরা তা মেনে চলব। এ প্রশ্নের উত্তর যেহেতু নির্দিষ্ট এবং তারাও অন্য উত্তর দেবে না, তাই) আপনি (ই) বলে দিন যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন (যখনই মুক্তি পাও) এবং (শুধু উল্লিখিত অন্ধকার থেকেই কেন,) সব দুঃখ-বিপদ থেকে (তিনিই তো উদ্ধার করেন, কিন্তু) তোমরা

(এরূপ যে,) তবুও (মুক্তি পাওয়ার পর যথারীতি) অংশীবাদিতা করতে থাক (যা চূড়ান্ত পর্যায়ের অকৃতজ্ঞতা অথচ ওয়াদা করেছিলে কৃতজ্ঞতার। মোট কথা, দুঃখ-বিপদে তোমাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা একত্ববাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর অস্বীকার গ্রহণযোগ্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নজীরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। অর্থ অন্ধকার। ظلمات البر والبحر এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক প্রকার রয়েছে ঃ রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধূলাবালির অন্ধকার, সমুদ্রের ঢেউয়ের অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বোঝাবার জন্য ظلمات শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অন্ধকার মানুষের প্রতি একটি নিয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ-বিপদাপদের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে ظلمة শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তফসীরবিদরা এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের হুঁশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব-দেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌কে আহবান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা, দেবদেবীরা বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদের বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেবদেবী এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন ঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন, বরং অন্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনিই উদ্ধার করবেন।

কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেবদেবীর পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা !

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে ঃ এক. আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য; অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্যবান। দুই. সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই করায়ত্ত এবং তিন. একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেবদেবীর পূজাকারীরাও যখন বিপদে পতিত হয়, তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই আহবান করে এবং তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে।

শিক্ষণীয় ঃ মুশরিকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে যত বড় অপরাধই হোক কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষার চাবুক বিশেষ। আমরা মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না বরং আমাদের সব ধ্যান-ধারণা বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মূর্তি ও দেবদেবীকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেবদেবীর চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ্ তা'আলার অপার মহিমার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর আমাদের নেই।

বিপদাপদের আসল প্রতিকার ঃ আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ঔষধকে এবং প্রত্যেক ঝড়-তুফান-বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, স্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ কোরআন পাক বারবার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণত মানুষের কুকর্মের ফল এবং পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্য এক প্রকার রহমত। কারণ, বিপদাপদ দিয়েই অমনোযোগী মানুষদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বোঝানোর জন্যই কোরআন পাক বলে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

অর্থাৎ আমি তাদের পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে ---যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ্ তা'আলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন।---(শুরা)

এ আয়াতের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ--কারও গায়ে কোন কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারও কোথাও পদস্খলন ঘটলে কিংবা কারও রোগ-ব্যথা দেখা দিলে তা সবই কোন-না-কোন গোনাহের প্রতিফল মনে করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা অনেক গোনাহ্ ক্ষমাও করে দেন।

বায়যাভী (র) বলেন : এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গোনাহ্গাররা যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গোনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপমুক্তদের রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া এবং জান্নাতে তাদেরকে উচ্চ স্তর দান করা হয়ে থাকে।

মোট কথা এই যে, পাপ থেকে মুক্ত নয়---এরূপ সাধারণ লোকেরা যে কোন অসুখ-বিসুখ, বিপদাপদ কষ্ট ও অস্থিরতায় পতিত হয়, তা সবই পাপের ফলশ্রুতি।

এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও সংকটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছেই দোয়া করা।

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, ঔষধ-পত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলাকৌশল অনর্থক। বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ্ তা'আলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামকেও তাঁরই নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। কেননা, সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই সৃজিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নিয়ামত। এগুলো তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে। অগ্নি, বাতাস, পানি, মৃত্তিকা এবং পৃথিবীর সব শক্তি তাঁর নির্দেশের অনুগামী ; তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অগ্নি দাহন করতে পারে না, পানি নির্বাপণ করতে পারে না, কোন ঔষধ ক্রিয়া করতে পারে না এবং কোন পথ্য রোগীর ক্ষতি সাধন করতে পারে না। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন :

خاک و باد و آب و آتش بنده اند
با من و تو مرده باحق زنده اند

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের পিছনে পড়েছে, তখন সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে : مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی

বিচ্ছিন্নভাবে কোন ঔষধ কিংবা ইঞ্জেকশনের উপকার প্রমাণিত হওয়া কিংবা কোন বস্তুগত কলাকৌশলের সাফল্য অর্জন করা অমনোযোগিতা ও পাপের সাথেও সম্ভবপর। কিন্তু যখন সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন এসব বস্তু ব্যর্থ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান যুগে মানুষকে আরাম দেওয়া ও কষ্ট দূর করার জন্য

কত রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম যে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। পঞ্চাশ বছর আগের মানুষ এসব বস্তুর কল্পনাও করতে পারত না। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য নতুন নতুন দ্রুত ক্রিয়াশীল ঔষধপত্র, নানা রকমের ইঞ্জেকশন এবং বড় বড় সুদক্ষ ডাক্তার ও স্থানে স্থানে হাসপাতালের প্রাচুর্য কার না জানা আছে। পঞ্চাশ-ষাট বছরের আগের মানুষ এগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত মানুষ আজকের মত এত বেশী রুগ্ন ও দুর্বল ছিল না। এমনিভাবে আজ ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধির জন্য নানা রকমের টীকা রয়েছে। দুর্ঘটনার কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য অগ্নি-নির্বাপক ইঞ্জিন, বিপদ মুহূর্তে তাৎক্ষণিক সংবাদ প্রেরণ ও তাৎক্ষণিক সাহায্যের উপায়াদি ও আসবাবপত্রের প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু এসব বস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ দুর্ঘটনা ও বিপদাপদের শিকার পূর্বের তুলনায় বেশী হচ্ছে। এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, বিগত যুগে স্রষ্টার প্রতি অমনোযোগিতা ও প্রকাশ্য অবাধ্যতা এত অধিক ছিল না, যতটুকু বর্তমানকালে রয়েছে। বিগত যুগে আরাম-আয়েশের সাজ-সরঞ্জামকে আল্লাহ্ তা'আলার দান মনে করে কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু আজকের মানুষ বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে এগুলো ব্যবহার করতে সচেষ্ট। তাই যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

মোট কথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরিকরা আল্লাহ্‌কেই স্মরণ করে---এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম ও কলাকৌশলের চাইতে অধিক আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মু'মিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে অর্থাৎ সব কলাকৌশল সামগ্রিক হিসাবে উলটো দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বারবার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করা হচ্ছে কিন্তু রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যত তা কার্যকরীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোড়া ছুটেই চলেছে। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ, চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্য সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যত লাভ-লোকসানের উর্ধ্বে উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলাকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর পর কোরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলাকৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত হিসাবে ব্যবহার করা। এ ছাড়া নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ
كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ (٦٥) وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ
قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ (٦٦) لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (٦٧)

(৬৫) আপনি বলুন ঃ তিনিই শক্তিমান, যিনি তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দেবেন এবং একে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি--- যাতে তারা বুঝে নেয়। (৬৬) আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের উপর নিয়োজিত নই। (৬৭) প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নেবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (আরও) বলুন ঃ (তিনি যেমন মুক্তি দিতে সক্ষম, তেমনি) তিনিই এ বিষয়ে শক্তিমান, যিনি তোমাদের প্রতি (তোমাদের কুফর ও শিরকের কারণে) কোন শাস্তি তোমাদের উপর দিক থেকে প্রেরণ করবেন (যেমন প্রস্তর, বাতাস কিংবা তুফান, বৃষ্টি) কিংবা পদতল (মৃত্তিকা) থেকে (প্রকাশ করবেন ; যেমন ভূমিকম্প কিংবা নিমজ্জিত হওয়া। এসব শাস্তির অবতরণ আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইচ্ছাধীন নয়। ইহকালে কিংবা পরকালে কোন-না-কোন সময় এরূপ হবে।) কিংবা তোমাদেরকে (স্বার্থের দ্বন্দ্ব দ্বারা বিভিন্ন) দল-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে (পরস্পরের) মুখোমুখি করে দেবেন (অর্থাৎ যুদ্ধে লিপ্ত করে দেবেন এবং তোমাদের একে অন্যের (প্রতি সংঘর্ষের স্বাদ) আস্বাদন করাবেন (এর এক একটি তোমাদের উপর আপতিত করবেন অথবা সব বিপদাপদ একত্র করে দেবেন। মোট কথা, মুক্তিদান করা কিংবা শাস্তি প্রদান করা উভয় কাজেই তিনি শক্তিমান। হে মোহাম্মদ (সা) আপনি দেখুন তো আমি কি (কি) ভাবে (একত্ববাদের) প্রমাণাদি বিভিন্ন দিক থেকে বর্ণনা করি! সম্ভবত তারা বুঝে যাবে এবং (শাস্তি দিতে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিমান হওয়া এবং কুফর-শিরকের কারণে শাস্তি হয় জেনেও) আপনার সম্প্রদায় (কুরাইশরা এবং আরবরাও) এ (শাস্তি)-কে মিথ্যা জ্ঞান করে (এবং শাস্তি না হওয়ায় বিশ্বাস করে) অথচ তা নিশ্চিত (বাস্তবে পরিণত হবে। তারা একথা শুনে বলতে পারে যে, কখন হবে ?) আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের উপর (শাস্তি অবতারণ করার জন্য) নিয়োজিত নই (যে, আমার বিস্তারিত খবর জানা থাকবে কিংবা ব্যাপারটি আমার ইচ্ছাধীন হবে। তবে) প্রত্যেক খবরের (মর্ম) বাস্তবায়িত হওয়ার একটি সময় (আল্লাহ্র জ্ঞানে নির্দিষ্ট) আছে এবং অচিরেই তোমরা অবগত হবে (যে, সে শাস্তি এসে গেছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সুবিস্তৃত জ্ঞান ও নজীরবিহীন শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদ মুহূর্তে যে তাঁকে আহ্বান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা, সমগ্র সৃষ্ট জগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর দয়াও অসাধারণ। তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও মমতা নেই।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অপর পিঠ বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে-কোন আযাব ও যে-কোন বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম তেমনিভাবে তিনি যখন কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যে-কোন শাস্তি দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ। কোন অপরাধীকে শাস্থি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার শাসনকর্তাদের ন্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী দরকার হয় না এবং কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এককে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন।

আল্লাহ্র শাস্তির তিনটি প্রকার ঃ এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ এক. যা উপর দিক থেকে আসে, দুই. যা নিচের দিক থেকে আসে এবং তিন. যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। عذابا শব্দটিকে تنوين সহ نكره উল্লেখ করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

তফসীরবিদরা বলেন ঃ উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মত-সমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আ'দ জাতির উপর ঝড়ঝঞ্ঝা চড়াও হয়েছিল, লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আবরাহার হস্তি-বাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভূষির ন্যায় হয়ে যায়।

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নীচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির আকারে এবং নীচের আযাব ভূ-তল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে পতিত হয়েছিল। ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারুন স্বীয় ধনভাণ্ডারসহ এ আযাবে পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ উপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ্ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নীচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, নওফর ও অধীনস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কতিপয় উক্তি থেকেও উপরোক্ত তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। মেশকাত শরীফে এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে ঃ كما تكونون يؤمر عليكم অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভাল কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসকবর্গ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা সৎ ও আল্লাহ্‌র বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু এবং সুবিচারক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি اَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ -এর অর্থ তাই।

মেশকাতে উল্লিখিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

----'আল্লাহ্ বলেন, আমি আল্লাহ্। আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি সব বাদশাহ্‌র প্রভু। সব অন্তর আমার করায়ত্ত। আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি বাদশাহ্ ও শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দিই। পক্ষান্তরে আমার বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে তাদের প্রতি কঠোর করে দিই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্যাতন করে। তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করো না বরং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন কর, যাতে আমি তোমাদের সব কাজ ঠিক করে দিই।

এমনিভাবে আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন যাতে প্রশাসক কোন ভুল করে ফেললে সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার জন্য অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ লোকদের তার পরামর্শদাতা ও অধীনস্থ করে দেওয়া হয়।

এসব হাদীস ও আলোচ্য তফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আযাব এবং যে কষ্ট অধীনস্থ